৺সারদাচরণ মিত্র প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

PUBLISHED BY
Saratkumar Mitra,
85, Grey Street, Calcutta.

Printed by G. B. Manna,
AT THE
Mitra Press,
45, Grey Street, Calcutta.

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

শ্রীশরৎকুমার মিত্রের নিকট, ৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতায়,
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ণ্ওয়ালিস্
ষ্ট্রীটস্থ দি বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেরিতে,
এবং অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

আমি তিনমাসকাল শয্যাগত, সুতরাং এ অবস্থায় "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা ভাল হয় নাই বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম প্রথম প্রুফ্ সীট্ আমি নিজে ও পূজ্যপাদ শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেখিয়া দিতাম। কিন্তু শেষাশেষি আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হেমন্তকুমার মিত্র, ব্যারিষ্টারের উপর ভার পড়ে। বোধ হয় লিপিভ্রম অনেক রহিল। পাঠকেরা ক্ষমাগুণে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

বৎসরাধিক অতীত হইল আমার পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয়ের এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা হয়। ইহার অনতিপরেই তিনি পীড়িত হন; দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া যাওয়ার ইচ্ছা তিনি শেষ শয্যায় বারম্বার প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার অনুমতি অনুসারে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া আমি যতশীঘ্র সম্ভব এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়াছিলাম; তথাপি শেষ ফর্ম্মা ছাপা হইবার পূর্ব্বেই তিনি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাড়াতাড়ির জন্য হয়ত অনেক ভুল রহিল এবং পিতৃদেবের মৃত্যু নিবন্ধন অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়ায় এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিলম্বও হইল। পাঠকগণ নিজগুণে ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনটি পিতৃদেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় লিখিয়াছিলেন। দেখিতেছি তারিখ দেন নাই। তিনি ৪ঠা সেপ্টেম্বার, ১৯১৭ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন; ইহার অল্পদিন পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপনটি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন।

যদি এই পুস্তক পাঠকবর্গের কোনরূপ উপকারে আইসে তাহা হইলে আমার পিতৃদেব এই সংস্করণ প্রকাশ হইতে দেখিয়া যান নাই বলিয়া আমার যে বিশেষ মনোকষ্ট আছে তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইবে।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য পিতৃদেব দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার হস্তলিপি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে তজ্জন্য পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই এবং এখনও হইল না।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফাল্গুন, ১৩২৪।

শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কয়েক বৎসর হইল "প্রবাসী" ও "উপাসনায়" এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অধিকাংশই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন সংশোধিত ও বর্দ্ধিত কলেবরে একত্র প্রকাশিত হইল। আজকাল পুরীযাত্রা সহজ হইয়াছে; ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি উৎকলের তীর্থ সমূহ পরিদর্শন করা আর আয়াসসাধ্য নহে। অবকাশ পাইলে অনেকেই পুণ্যচয়ন অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উৎকলাভিমুখ হইয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা তাঁহাদের উৎকল-পর্য্যটনে সাহায্য হইতে পারে। উৎকলে অনেক আর্য্যকীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; পৌরাণিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কীর্ত্তিরাশি প্রায় সকল তীর্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। একালের তীর্থযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ের বর্ণনার সহিত বর্ত্তমানেরও আভাস দেওয়া হইল।

শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ বসুর "তীর্থদর্শন" গ্রন্থ অনেকে পাঠ করেন নাই; অথচ তাহা, বাঙ্গালী কেন, ভারতবাসী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। তাঁহার নিকট আমি বিশেষরূপে ঋণী।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৫শে আষাঢ়, ১৩১৬। } শ্রীসারদাচরণ মিত্র

শুদ্ধিপত্র

১০ পাতা—শেষ পংক্তি—"শ্বিল" স্থানে "ছিল" হইবে।

৪৪ পাতা—১ম পংক্তি—"তৃতীয়" পরিচ্ছেদের স্থানে "চতুর্থ" পরিচ্ছেদ হইবে।

৭৭ পাতা—২২ পংক্তি—"গাঁপালীনির" স্থানে "গোপালিনীর" হইবে।

১২৫ পাতা—১ম পংক্তি—"ষষ্ঠ" পরিচ্ছেদের স্থানে "পঞ্চম" পরিচ্ছেদ হইবে।

সূচীপত্র।

অনুক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বালেশ্বর জেলা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(কটক জেলা)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পুরী বিভাগ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দাক্ষিণাত্য।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

(১)

অনুক্রমণিকা।

বঙ্গদেশ ও উৎকল, সুকোমল, শান্তিময় ও প্রেমময় জ্যোতির অপরিমেয় আধার নবদ্বীপচন্দ্রের প্রধান লীলাভূমি। নবদ্বীপ তাঁহার জন্মভূমি ও কৈশোরলীলার স্থল। চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র-গ্রহণ সময়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নবদ্বীপেই শচীদেবীর ক্রোড়ে, গুরুগৃহে ও নিজের অধ্যাপনাগৃহে চব্বিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া চৌদ্দশত একত্রিশ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বর্দ্ধমানজেলার ভাগীরথী-তীরস্থ কাটোয়ায় (কণ্টক নগরে) কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা-গ্রহণ করেন। সেই দিন শচীমাতার নিমাই, গুরুর নিকট "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম প্রাপ্ত হন। সেই দিন হইতেই তিনি

> তপ্তকাঞ্চন-বপুর্দ্দণ্ডধৃক্
> রক্তবস্ত্রপরিবেষ্টিতদেহঃ।
> মেরুশৃঙ্গ ইব গৈরিকযুক্-
> স্তেজসা রবিরিব প্রচকাশে॥ মুরারি।

তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি দণ্ডধারী রক্তবস্ত্রপরিধায়ী শ্রীচৈতন্যদেব গৈরিকাচ্ছাদিত মেরুশৃঙ্গের ন্যায় ও তেজে সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নবদ্বীপে হরিনামামৃতের বীজ

বপন করিয়া সেইখানেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের প্রথম বিস্তার করিয়াছিলেন। উৎকল তাঁহার মানবজীবনের মধ্য ও অন্ত্যলীলার স্থল এবং উৎকলেই তাঁহার পার্থিব লীলার অবসান হয়। "ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে উৎকলের ন্যায় দেশ নাই" এই ঋষি-উক্ত বাক্যের তিনি ভূয়িষ্ঠরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই বঙ্গদেশে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের জ্যোতিবিস্তারের অন্যতম কারণ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তাঁহার মূর্ত্তি অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তির ন্যায় এখনও পূজিত এবং এখনও সমগ্র উৎকলে সহস্রাধিক মন্দিরে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ, বিষ্ণু-মূর্ত্তির সহিত, তাঁহার দারুবিগ্রহ প্রত্যহ সাদরে পূজিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেতর উড়িষ্যাবাসিরা প্রায়ই মহাপ্রভুর সাম্প্রদায়িকগণের শিষ্য ও সেবক। ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই পঞ্চোপাসক, কিন্তু চৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্মবিস্তার-নিবন্ধন, সাধারণ লোকে প্রায়ই তৎপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত। উড়িষ্যার ভাষা বঙ্গভাষা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থ উড়িষ্যায় সর্ব্বত্র আদৃত ও সর্ব্বদাই পঠিত হয়। বস্তুতঃ উড়িয়া ও বাঙ্গালীতে আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মে ও ভাষায় যৎসামান্য প্রভেদ। পার্থক্য এত কম যে উভয়কে এক জাতীয় বলাই ঠিক।

আর্য্যনিবাসবিস্তারের পূর্ব্বে বঙ্গীয় উপসাগরের উত্তর-পশ্চিমপার্শ্বস্থ সমতল প্রদেশ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী ছিল না। তথায় স্থানে স্থানে নিকটস্থ পার্ব্বত্য বর্ব্বরজাতিরা সময়ে সময়ে বাস করিত। ক্রমশঃ বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী, দয়া প্রভৃতি নদীসমূহের নৈসর্গিক ক্রিয়ায় ভূমি উচ্চ ও বাসোপযোগী হওয়ায় পার্ব্বত্য বর্ব্বরজাতি সমূহের বাসবিস্তার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আর্য্যগণ ঐ বর্ব্বরজাতিগণকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়া ঘৃণা করিতেন এবং যে সকল আর্য্যজাতীয় ব্যক্তিগণ ম্লেচ্ছ-প্রধান দেশে বাস করিতেন, তাঁহারা ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।* শবর, কান্দ ও কোল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি এখনও উৎকলের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে

* বৃষলত্বং গতা লোকে ইমা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। মনুঃ।

তাহাদের মধ্যে অনেকেই নূতন আর্য্য-নিবাসে শূদ্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। ক্রমশঃ উড়িষ্যাপ্রদেশ আর্য্যনিবাসের অন্তর্গত হইয়া ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় আর্য্যদিগেরও পুণ্যভূমি হইয়াছে। বর্ত্তমান পুরী জেলায় শবর-জাতিই পুরাকালে প্রবল ছিল, এখনও পুরীর পার্ব্বত্যপ্রদেশে অনেক শবর বাস করিতেছে। অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা ম্লেচ্ছ জাতি-বিশেষ; কিন্তু টীকাকার ভরত বলিয়াছেন—"পত্রপরিধানঃ শবরঃ।" এখনও এই জাতির অনেকেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে পত্রপরিধান করে। ইহারাই এককালে পুরী অধিকার করিয়াছিল। গ্রীক্ গ্রন্থকারগণ শবরজাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আর্য্যজাতির সহবাসে সমতলবাসী শবরগণ সভ্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয় এবং শবরজাতীয় "বসুর" প্রতিই ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। * তৎকালে ভারতবর্ষের এই অনার্য্য-প্রদেশ অপবিত্র ছিল; কিন্তু কাল নিরবধি; কালে অপবিত্র ভূমি পবিত্র ক্ষেত্র হইয়াছে। শাক্য-সিংহ বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম উৎকলে বহুল বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং পরে অনেক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক যতি তদ্দেশস্থ পাহাড়ের উপর বাস করিতেন। সম্ভবতঃ উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া-ছিল। প্রবাদ আছে যে, ৫৪৩ পূঃ খৃঃ অব্দে শাক্যসিংহের দেহাবসান হইলে তাঁহার একটী দন্ত বহুদেশে ক্রমান্বয়ে নীত হইয়া বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনে আনীত হয় এবং তথা হইতে পুরীতে রক্ষিত হয়। পালী মহাবংশের ১৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, শাক্যসিংহের একটী দন্ত পাটলিপুত্রনগর হইতে আনীত হইয়া দন্তপুরে প্রথম রক্ষিত হয়। তৎপরে তাম্রলিপ্তি (তমলুক) হইতে সমুদ্রযানে ৩১০ খৃঃ অব্দে সিংহলে নীত হয়।

---

* প্রণম্য শিরসা বিপ্রস্তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিস্ততঃ।
ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পলিতাঙ্গকঃ॥ ইত্যাদি।
উৎকল খণ্ডম্।

দন্তপুরী কোথায় তাহা স্থির করা সহজ নহে। কোন কোন প্রত্নবিদ্‌গণ বলেন যে বর্ত্তমান দাঁতন-নগর মহাবংশের দন্তপুরী। অপরে বলেন পুরীই দন্তপুর। সে যাহা হউক, পুরী এককালে বৌদ্ধনগর থাকার প্রমাণ আছে; পুরী বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পুরী পৌরাণিকগণের পবিত্র স্থান ছিল কিনা বলা যায় না। আমার বিশ্বাস বারাণসী ও গয়াক্ষেত্রের ন্যায় ইহা আর্য্যদিগের বহুকালের পুণ্যভূমি।

উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল বিস্তারের প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দয়া নদীর তটস্থ ধৌলিপর্ব্বতে অশোকরাজের অনুশাসনস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের সময় ২৫০ পূঃ খৃঃ অব্দ। প্রসিদ্ধ আর্য্যতীর্থ যাজপুরে ও তন্নিকটে বুদ্ধদেবের অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং তথাকার সব-ডিভিজানল মাজিষ্ট্রেটের বাসগৃহের সম্মুখে একটী পদ্মপাণিমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের নিকট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভারতবাসীদিগের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, সাত শত বৎসরের অধিককাল বৌদ্ধধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। কিছুকাল বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল, কিন্তু কেশরী ও গঙ্গাবংশীয়গণের রাজত্বের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের পূর্ণবিকাশে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সপ্তম খৃষ্টশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউওথ্‌সং তথায় বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই প্রচলিত দেখেন; আরও দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হয় বলা যাইতে পারে। পরে ষোড়শ খৃষ্টশতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রায় নিঃশেষ হয়। কথিত আছে বৌদ্ধেরা অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

৪৭৪ খৃঃ অব্দে হিন্দুচূড়ামণি কেশরীবংশোদ্ভব যযাতি কেশরী উৎকলে তন্নামধেয় রাজবংশ সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সময়েই উৎকলে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ কেশরী রাজবংশের

ও তাহার পরবর্ত্তী গঙ্গাবংশীয় রাজগণের যত্নে সেই মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হওয়াতে উৎকল সকলেরই পবিত্র তীর্থভূমি হইয়াছে। উৎকলে সহস্রাধিকবর্ষ হিন্দু-রাজগণ নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছেন; তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার ও ধর্ম্ম-বিস্তার-লালসার অক্ষয়চিহ্নের বিষয় ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা উৎকলে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করান এবং অদ্যাপি তাঁহাদিগের "শাসন" বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের ব্যয়ে ও যত্নে ম্লেচ্ছ শবরনিবাস পবিত্র আর্য্যনিবাস হইয়াছে। উত্তরভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ মুসলমানাধিকৃত হইবার পরও প্রায় চারিশত বৎসর উৎকলের গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ আফ্গান ও পাঠানগণকে বৈতরণী পার হইতে দেন নাই; বরং সময়ে সময়ে তাঁহারা ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার এবং উত্তরে ভাগীরথী ও দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত সমস্ত কলিঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। রাজস্বের অধিকাংশই তাঁহারা দেবমন্দিরনির্ম্মাণে ও ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিতেন।

পাশ্চাত্য আর্য্যভূমিতে, পঞ্চনদ ও সিন্ধুপ্রদেশে, বিদেশীয় শত্রুপ্লাবনভয়ে রাজা প্রজা সকলকেই সতত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। অষ্টম খৃষ্টশতাব্দী হইতেই মুসলমান জয়পতাকা তথায় সময়ে সময়ে অস্থায়ীভাবে উড্ডীয়মান হইয়া চারিশত বৎসরের মধ্যে স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা, যমুনা ও উক্ত নদীদ্বয়ের শাখা-প্রশাখা বিধৌত আর্য্যাবর্ত্তের মধ্য প্রদেশে বহুকালাবধি বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম লোকসমাজকে আলোড়িত করিতেছিল। চীনপরিব্রাজক হিউঙ্থ্সং কান্যকুব্জ ও নালন্দে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমপ্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। এ দিকে দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীর শেষ ভাগেই তথায় মুসলমান রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হইয়া প্রায় পঞ্চদশ শতবর্ষ মধ্যে অন্য দেশে নীত হয়; ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই এরূপ দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাসন বিদ্যমান ছিল না ও নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতেই তিব্বতে নীত হয়। সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ যে বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতা প্রাপ্ত হয় তাহার

ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। বিজয়সিংহ প্রভৃতি বঙ্গীয় সিংহবংশীয় রাজন্য-গণের নামে লঙ্কা সিংহলনাম প্রাপ্ত হইয়াছে। * বঙ্গে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের প্রায় অর্দ্ধলক্ষ বাঙ্গালী বৌদ্ধ; তাহারা চাক্‌মা বা বড়ুয়া। তাহাদের মতে মগধদেশ হইতে আসিয়া চট্টগ্রামে বাস করায় তাহারা "মগ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, বেশ বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে বঙ্গদেশে কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। আবার সেনরাজা-দিগের রাজত্বের অল্পকাল পরেই মুসলমানধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রায় স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এদিকে উড়িষ্যার কেশরী ও গঙ্গবংশীয় রাজগণ ৪৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে বহুকাল নিঃশঙ্কভাবে রাজত্ব এবং সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বস্তুতঃ ১৫৬৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন মুসলমান যোদ্ধা বৈতরণীনদী পার হইয়া স্থায়ীভাবে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারেন নাই। সেই বৎসরই বঙ্গের নবাব সলিমানের সৈন্যাধ্যক্ষ কালাপাহাড় রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটে পরাজয় ও নিধন করিয়া বৈতরণী পার হইয়া পবিত্র উৎকলদেশের পবিত্রতা লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

১৪৩১ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ সশিষ্যে উৎকলে প্রথম গমন করেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাসদীক্ষার পর তিন দিন রাঢ়দেশে হরিনামামৃত বর্ষণ করিয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের বাটীতে আগমন করেন। তথায় মাতা শচীদেবীর স্বহস্তের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া,তৎপরদিন ভক্তিভাবে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া ও নবদ্বীপের বৈষ্ণব সহচরগণকে সাক্ষাৎ দান করিয়া—

—"গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে।"

(শ্রীকৃষ্ণদাস—চৈতন্যচরিতামৃত)

সঙ্গে নিত্যানন্দ গোসাঞী, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ

* মহাবংশ।

দত্ত। * কৃষ্ণদাস ও বৃন্দাবনদাস, গোবিন্দের (গোবিন্দ কামারের) নাম উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলেন তিনি দাসস্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন। †

এই সময়ে উৎকলে গঙ্গবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৈদিক-ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত ছিল—

* বৃন্দাবন দাসের মতে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। মুরারি গদাধরেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

"ততঃ প্রতস্থে ভগবান্ মুকুন্দগদাধরাদ্যৈর্দ্বিজসজ্জনৈঃ প্রভুঃ।
পুরোঽবধূতং প্রণিধায় দেবো ররাজ কাব্যেন যথোড়ুপেশঃ॥" মুরারি।

† গোবিন্দের কড়চার প্রকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করেন ইহা আধুনিক গ্রন্থ; প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে গোবিন্দের নামোল্লেখ নাই এবং তাঁহার কড়চার অনেক স্থলেই আধুনিক রচনার আভাস পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরের চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যের ১৩শ সর্গের নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় হইতে বোধ হয়, কোন গোবিন্দ-দাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর তাঁহার পরিচর্য্যায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রথম নিযুক্ত হন। কিন্তু সে গোবিন্দ ঈশ্বরপুরী ভৃত্য ছিল। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা।

অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ঃ
সতু গোবিন্দ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
বহুতীর্থপরিভ্রমাদ্বহিঃ
স মহান্ পুণ্যপয়োনিধির্যযৌ॥ ১৩০
পুরুষোত্তমমেব তত্র তং
দয়িতং গৌরকৃপামহানিধিং।
স দদর্শ চ পাদপদ্ময়োঃ
পরিচর্য্যাসু রতোঽভবন্মুহুঃ॥ ১৩১
অয়মপাতিভাগ্যবাংস্ততঃ
প্রভৃতি শ্রীপ্রভুপাদপদ্ময়োঃ।
নিকটস্থ ইতো দিবানিশং
পরিচর্য্যামকরোদ্গতক্রিয়ঃ। ১৩২ কবিকর্ণপুর।

উত্তরে বিরজাক্ষেত্র, পূর্ব্বে অর্কক্ষেত্র, পশ্চিমে হরক্ষেত্র বা একাম্রক্ষেত্র ও দক্ষিণে পুরুষোত্তম বা বিমলাক্ষেত্র। তন্মধ্যে মহানদীর দক্ষিণের এ দেশ ক্রমশঃ পদে পদে পুণ্যতর হইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রই সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ হইয়াছে।* নীলাচলস্থ শবময় বিষ্ণুমূর্ত্তিদর্শনই মহাপ্রভুর উৎকলগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। বৃন্দাবনদাসকৃত ভক্তিময় চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দকৃত সুমধুর চৈতন্যমঙ্গল, মুরারি মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত ও শাস্ত্রসমূহের ও কৃষ্ণভক্তিমার্গের সামঞ্জস্যদর্শয়িতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও গোবিন্দের কড়চায় নবদ্বীপচন্দ্রের উৎকললীলার বিশেষ বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস বৃন্দাবনদাসের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ বৃন্দাবনদাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস ও মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর উৎকললীলার প্রধান কথক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সময়ে বঙ্গদেশের স্বাধীন মুসলমান রাজা হোসেন সাহার † সহিত উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের বিগ্রহ চলিতেছিল। প্রতাপ-রুদ্রদেব ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপশালী ছিলেন। ১৫১০ খৃঃ অব্দে হোসেন সাহার সৈন্যাধ্যক্ষ ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং প্রতাপরুদ্রদেব তৎকালে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে থাকায়, মুসলমান বীর উড়িষ্যার রাজধানী কটক অধিকার করিয়া পুরী পর্য্যন্ত দেশলুণ্ঠন করেন। তৎকালে উড়িষ্যাবাসিগণ স্বাধীনতাপ্রিয় ও বীরোচিত শস্ত্রব্যবহারী ছিল। তৎকালে শৌর্য্যবীর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে উড়িষ্যাবাসিরা বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা স্বাধীন ছিল ও স্বাধীনতার গৌরব জানিত। বখ্‌তীয়ার খিলিজী ১২০৩ খৃঃ অব্দে সপ্তদশ জন সৈন্য লইয়া নবদ্বীপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

* উৎকল খণ্ড।

† ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন হোসেন সাহা বঙ্গে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

এরূপ প্রবাদ আছে, কিন্তু তিনি উৎকলে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। মধ্যে মধ্যে মুসলমান বীরেরা উৎকল অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। বাঙ্গলাবিজয়ের পর সাড়ে তিন শত বৎসর উৎকলবাসিরা মুসলমান সৈন্যসামন্তকে ক্রমান্বয়ে পরাজয় করে। হোসেন সাহার সৈন্যাধ্যক্ষ অতি সত্বরই উৎকলত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৫১০ খৃঃ অব্দে, অর্থাৎ যে বৎসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথদর্শনে গমন করেন সেই বৎসর, প্রতাপরুদ্রদেবের চতুরঙ্গসেনা সুবর্ণরেখা পার হইয়া বঙ্গদেশে বিচরণ করিতেছিল। সুবর্ণরেখা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বিগ্রহস্থান হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস ভক্তগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন—

"তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখনও কেহো পথ নাহি বয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবৎ উৎপাত কিছু উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥
প্রভু বোলে "যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব আমি করিনু নিশ্চয়॥"

কথিত আছে যে গঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা চোড়-গঙ্গদেব বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। পঞ্চম রাজা অনঙ্গভীমদেব ১১৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তিনি ভাগীরথী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল উৎকলের (উত্তর কলিঙ্গের) রাজা ছিলেন না; তিনি কলিঙ্গদেশের রাজা ছিলেন এবং ভাগীরথীর পশ্চিমদিক হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিবেচনা করেন যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বঙ্গীয় উপসাগরের নিকটস্থ ভূমি পুরাতন কলিঙ্গদেশ। কিন্তু এখন

উৎকলের নিম্নভাগে কলিঙ্গ। মহাভারতের বাণপর্ব্ব হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে গঙ্গার পশ্চিমতীর হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত উৎকল, ও তদ্দক্ষিণ গোদাবরী পর্য্যন্ত কলিঙ্গ ক্রমশঃ সমস্ত প্রদেশ কলিঙ্গ রাজাগণের অধীন হইয়া সমস্তই কলিঙ্গ নাম প্রাপ্ত হয়। এসম্বন্ধে অনেক মতভেদও আছে। ক্রমশঃ রাজ্যের সঙ্কোচ হইয়া রূপনারায়ণ উৎকলরাজ্যের সীমা হইয়াছিল এবং বঙ্গ-দেশের শেষ নবাবদিগের আমলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড উৎকলরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অধিকার করিতেন। সুবর্ণরেখা ও রূপ-নারায়ণের অন্তর্গত প্রদেশ নবাবদিগের উড়িষ্যা-রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখের সনন্দে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে উড়িষ্যা রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার মধ্যগত প্রদেশ; এক্ষণে ইহা মেদিনীপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে সুবর্ণরেখা এক্ষণে উৎকলের উত্তর পশ্চিম সীমা; কিন্তু ১৫১০ খৃঃ অব্দে সুবর্ণরেখাই প্রকৃত উৎকলের উত্তর পশ্চিম সীমা ছিল কিনা সন্দেহস্থল। বোধ হয় ভাগীরথীর পশ্চিম, সমুদ্র হইতে কিয়দ্দূরস্থ উত্তর দেশ, রাঢ় নামে খ্যাত ছিল এবং রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগ ছিল। সমুদ্রের নিকটস্থ প্রদেশ পুরাতন কলিঙ্গ; উহা তৎকালে ওড্র নামে খ্যাত ছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—–:*:—–

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শান্তিপুর হইতে জাহ্নবীর পূর্ব্ব কূলে কূলে আসিয়া ছত্রভোগে শতমুখী গঙ্গা দেখিতে পাইলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার কড়চায় ছত্রভোগের উল্লেখ করেন নাই। তিনি বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাজিপুর ও নারাশেলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এই সকল স্থানের উল্লেখ নাই। ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাটের নাম "অম্বুলিঙ্গ ঘাট" ছিল এবং তথায় "জলময় অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর" বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইল অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিলাইল॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব যে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা॥
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিল বিনয়॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্ব্বজনে॥—

শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বর্ত্তমান থানা মথুরাপুরের এলাকাধীন ও মথুরাপুর গ্রামের নিকটস্থ ছত্রভোগ এককালে গণ্ডগ্রাম ছিল। কুলপী রোডের দুই মাইল পূর্ব্বে ছত্রভোগগ্রাম এক্ষণে জেলা চব্বিশ পরগণার কালেক্টরীর ১২৭০ নং তৌজীভুক্ত। তথায় অদ্যাপি ৺ত্রিপুরাসুন্দরী ঠাকুরাণীর মঠ অবস্থিত। চক্রবর্ত্তীগণ ঐ মঠের সেবায়েৎ। নিকটেই এবং জয়নগর-মজীলপুর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী জমীদারীর অন্তর্গত ছত্রভোগ হইতে এক পোয়া দূরে, ৺বদ্রিকানাথ মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির। মহাদেব অনাদিলিঙ্গ; সেবার বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল; এখন প্রায়ই সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। চৈত্রমাসে নন্দায় এখানে একটী মেলা হয় ও বহুতর লোক তথায় পুণ্যস্নান করে। তথায় প্রবাদ যে সতীদেহের বক্ষঃস্থল পতিত হওয়ায় সেই স্থান পীঠস্থান হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নভূমিমাত্র ভাগীরথীর অস্তিত্বের চিহ্ন বিদ্যমান; কিন্তু ভাগীরথীর গর্ভ এখনও চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ছত্রভোগ নবাব হোসেন সাহার কর্ম্মচারী রামচন্দ্র খানের অধিকারস্থ ছিল। ভাগীরথীর অপর পারেও এক্ষণে চব্বিশপরগণা জেলা। তথায় ভাগীরথী এখন মজিয়া গিয়াছে; ১৫১০ খৃঃ অব্দে ভাগীরথী তথায় প্রবল নদী; তখন নদীর অপর পারে যাইতে নৌযানের প্রয়োজন হইত। অপর পারের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন ;—

> "এবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
> সে দেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
> রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
> পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত।

অপর পারেই ওড্রদেশ (উড়িষ্যা) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নীলাচল গমন পথে ছত্রভোগ হইতে ভাগীরথী নৌযানে পার হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ওড্রদেশ পৌছিলেন ;—

> "হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রসে।
> প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে।

উত্তরিলা গিয়া প্রভু শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্র দেশে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেমরসে॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

নদীর পশ্চিমতীরে শ্রীপ্রয়াগঘাট; ভাগীরথী তথায় শতমুখী হইয়াছেন; ডায়মণ্ড হারবারের নিকটেই নদীর ঘাট। বৃন্দাবনদাস ঘাটের আর এক (বা তৎকালের স্থানীয়) নাম গঙ্গাঘাট বলিয়াছেন। তথায় পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরস্থাপিত শিবলিঙ্গ ছিল। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান চব্বিশপরগণার কতক অংশ এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ উৎকল বা ওড্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ইংরাজদিগের প্রথম আমলে এবং দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ ১৮০৪ খৃঃ অব্দে শেষ হওয়ার পূর্ব্বে, ইহাই ইংরাজদিগের উড়িষ্যা ছিল। ১৮০৪ অব্দে প্রকৃত উৎকল দেশ ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছিল

ভাগীরথীর কোন অংশই তখন টালির নালায় (Tolly's Nulla) পরিণত হয় নাই। তখন "কাটি-গঙ্গা" নামের উৎপত্তি হয় নাই। এখনকার ভাষায়, অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় ইংরাজী ভাষায়, "পদ্মার" উন্নতি হইয়া তিনি গঙ্গা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গঙ্গা ও অগঙ্গা জড়াইয়া "হুগলী" হইয়াছে। হুগলীর উত্তরাংশ ভাগীরথী। কালস্রোতে পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। ক্ষিত্যপ্তেজের প্রভাবে যেখানে নদী ছিল না, সেখানে বেগবতী নদী, এমন কি সমুদ্রও দেখা যায়; যেস্থান মহাসমুদ্রের লীলাস্থল ছিল, সেখানে মানববাসোপযোগী ভূমি দৃষ্ট হয়। গঙ্গার নদীমুখেরও ক্রমশঃ অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও নৈসর্গিক ক্রিয়ায় আরও পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। তাহার উপর আবার মানুষের হাত আছে। সেকালে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, ভাগীরথী কলিকাতার দক্ষিণ দিয়া কালীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুর, মাহীনগর, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামকে নদীসনাথ করিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ভাগীরথীর ঐ মুখই পূর্ব্বভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রগমনের দ্বার ছিল। এমন কি ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর শেষভাগেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়া গিয়াছেন যে, ধনপতি সদাগর ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর বৈষ্ণবাটীর নিমাইতীর্থ ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া ঐ পথ দিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন :—

"নিমাইধামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
প্রভাত হইল সাধু মেলে সাতনায়।
সেইদিন সদাগর হেতেগড় পায়॥"

তাহার পর মগরায় যাইয়া তাহারা উভয়েই বিষম ঝটিকায় পড়িয়াছিল। তাহার পর—

"দক্ষিণে মদনমল্ল বামে বীরখানা।
কোরোয়ালের ঝুমঝাম নদী জুড়ে ফেনা॥
কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের দহ বামদিকে থুয়া॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে॥"

কোন কোন প্রচলিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্রও দেখিতে পাওয়া যায়—

"ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধু চালা।
ছত্রভোগ উত্তরিলা অবসান বেলা॥
মহেশ পূজিয়া সাধু চলিলা সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিল সদাগর॥"

বর্ত্তমান হেষ্টিংসের দক্ষিণে ও খিদিরপুরের উত্তরে আদিগঙ্গা খুব প্রশস্ত ছিল এবং তথা হইতে শাঁকরাল পর্য্যন্ত কোন নদী ছিল না। শাঁকরালের দক্ষিণে সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া আরও দক্ষিণে যাইয়া দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদির সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। খিদিরপুর হইতে

শাঁকরাল পর্য্যন্ত হুগলীনদী কাটিগঙ্গা নামে খ্যাত ও হিন্দুর নিকট তাহার পবিত্রতা নাই। কাটিগঙ্গা ভাগীরথ খাদ নহে; হুগলীনদীর এই অংশ ষোড়শ শতাব্দীতে খাত হয় এবং ভাগীরথী ও সরস্বতী এই খাল দ্বারা প্রথম সংযুক্ত হয়। ক্রমশঃ মূল ভাগীরথী (আদিগঙ্গা) মজিয়া যাওয়ায় জলপ্রবাহ ঐ খালে প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় বর্ত্তমান কাটিগঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও খিদিরপুর ও শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের মধ্যে কাটিগঙ্গার অংশ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। এই নদী-অংশের গঙ্গামাহাত্ম্য না থাকায় তৎপার্শ্বের গ্রামের লোকেরা উত্তরে শিবপুরগ্রামে আসিয়া গঙ্গাস্নান করেন। এখন "পদ্মা" গঙ্গানদীর একাংশ বলিয়া ভূগোলে লিখিত হয়; কিন্তু পদ্মার বিস্তৃতি ও জলরাশির গৌরব আধুনিক। এমন কি গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে (খৃঃ ১৭৮০) মেজর রেনেল সাহেব যে বঙ্গদেশের নদী-সমূহের নক্সা প্রস্তুত করেন, তাহাতেও পদ্মার বর্ত্তমান বিস্তৃতি দেখা যায় না। তৎপূর্ব্বে নবাবদিগের আমলেই ভাগীরথী ও পদ্মার সন্ধিস্থান, ছাপঘাটীর মোহানা, বালুকারাশিতে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং গঙ্গার জল অধিকাংশই পদ্মাদ্বারা বঙ্গীয় উপসাগরে পড়িতেছিল। যাহা হউক, খরস্রোতা বিস্তৃতজলরাশিময়ী "পদ্মা" আমাদের গঙ্গার একাংশ নহে। হুগলী নদীর সমস্তও আমাদের গঙ্গার অংশ নহে। আমাদের গঙ্গা গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়া হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানসমূহকে পবিত্র ও নদীসনাথ করিয়া রাজমহলের অনতিদূরেই দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এবং মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা, ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট পার হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে দক্ষিণদেশে ভাগীরথ খাদের লোপ হইয়াছে; এখন স্থানে স্থানে ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা নামের পুষ্করিণী ভাগীরথ খাদের লুপ্তাবশেষ। ছত্রভোগের নিকটেই চক্রতীর্থ হইতে ভাগীরথী শতমুখী হইয়া মহাসাগরে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে পশ্চিমবাহিনী স্রোতস্বতীই ভাগীরথী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। ভূতত্ত্ব-

বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে বঙ্গীয় উপসাগরের লবণাম্বুরাশি এককালে রাজমহল পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বপার্শ্বে ক্রীড়া করিত এবং গঙ্গা ও সাগরের প্রথম সঙ্গমস্থান রাজমহলের নিকটেই ছিল। ক্ষিত্যপ্‌তেজের নৈসর্গিক ক্রিয়ায় ক্রমশঃ বঙ্গীয় সাগরের উত্তরাংশ মজিয়া যাওয়ায় গঙ্গার সাগরসঙ্গমস্থান ও ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছিল। এক্ষণে গঙ্গার পশ্চিম শাখারই পবিত্রতা আছে। এখন সাগরসঙ্গম গমনের পথ "হুগলীনদীর" মুখ; কিন্তু ভাগীরথীর পুরাতন স্রোতস্বতী মুখ যেখানে বর্ত্তমান "হুগলীনদীর" সহিত মিশ্রিত ছিল তাহাই আমাদের "সাগরসঙ্গম"; সেই স্থানই "মকরে" অর্থা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ত স্নান করিয়া আমরা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকি।

ছত্রভোগে নবাব হোসেন সাহার কার্য্যাধ্যক্ষ তান্ত্রিক রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়াছিলেন।* তিনি মহাপ্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণের ভাগীরথীর অপর পারে নৌযানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে শ্রীপ্রয়াগঘাটে উপনীত হইলেন। সেই ঘাটের আর একটী নাম গঙ্গাঘাট। তথায় স্নান করিয়া যুধিষ্ঠিরস্থাপিত মহেশকে প্রণাম করিলেন।

"যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথা আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

এক্ষণে গঙ্গাঘাটের চিহ্নমাত্র আছে; ভাগীরথীর অন্তর্ধান হইয়াছে। এখন আর নৌযানে ছত্রভোগ হইতে গঙ্গাঘাটে যাইতে হয় না। নদীগর্ভে

* শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।

"সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্ত্তন।
উষাকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥
কতদূর গেলে মাত্র "দানী" দুরাচার।
রাখিলেক দান চাহে না দেয় যাইবার॥"—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

জল নাই, নিম্নভূমিতে ধান্যক্ষেত্র। অনাদিলিঙ্গ মহাদেব এক্ষণে বদ্রিকানাথ নামে খ্যাত। নিকটেই কুলপী যাইবার রাজপথ। কুলপী "হুগলীর" প্রায় ১৪ ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ স্থান। তাহার অনতিদক্ষিণে সাগরসঙ্গম। খাড়ী গ্রাম হইতে গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী হইয়া সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদীর মোহানা বা নদীমুখের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গীয় উপসাগরে পবিত্র বারিরাশি নিঃসরণ করিতেন। এখন সে পশ্চিম বাহিনী গঙ্গার চিহ্ন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সাগরসঙ্গমের অতি নিকটেই বর্ত্তমান সাগরদ্বীপ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছত্রভোগে ভাগীরথী পার হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। এই স্থান এখন জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত। সম্ভবতঃ তিনি সশিষ্যে সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণের নদীমুখ কুল্পীর নিকটেই পার হন। তখন সে নদীমুখ এখনকার মত প্রশস্ত ছিল না। তখন ভাগীরথীর জল ঐ মুখদ্বারা নিঃসৃত হইত না। বোধ হয় এই স্থানেই পারের সময়ে তিনি পাটনীর উৎপাতে পড়িয়াছিলেন।

দানী পারঘাটে দান লইত, দান না পাইলে কাহাকেও যাইতে দিত না। মহাপ্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণকেও যাইতে বাধা দিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে তাঁহার অলৌকিক ভাবাদি দর্শনে সে মুগ্ধ হইয়াছিল—

> "আস্তে ব্যস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
> দণ্ডবৎ হই পড়ে বিনয় বচনে॥
> কত কোটি জন্ম হইতে আছিল সম্বল।
> তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল॥"
>
> শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তাম্রলিপ্ত (তমলুক)।

তখনকার ওড্রদেশে, এখনকার বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলায়, রূপনারায়ণ নদীর উপর তাম্রলিপ্ত অবস্থিত। দয়ানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন—

চৈতন্য দেবনদ পার হৈঞা,
উত্তরিলা তমোলিপ্তে সেয়াখালা দিঞা।"

তাম্রলিপ্ত, তমোলিপ্ত বা তমলুক এককালে প্রসিদ্ধ প্রদেশ ছিল এবং তন্নামখ্যাত বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এককালে ইহা সমুদ্র-তটেই তাম্রলিপ্ত প্রদেশের রাজধানী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে এই প্রদেশ কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম পার হইতেই কলিঙ্গ প্রদেশ আরম্ভ হয়। পরে কিছুকালের নিমিত্ত তাম্রলিপ্ত পৃথক রাজত্ব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সময়ে ইহা নিশ্চয়ই উৎকলের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে তাম্রলিপ্ত সহর রূপনারায়ণের সাগরসঙ্গম হইতে বহুদূরে ও সাগরতট হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। পালি "মহা-বংশ" প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্ব খৃঃ অব্দ ৩১০ সনে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী তমলুক বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে মহাবোধিদ্রুমের শাখা বুদ্ধগয়া হইতে আনীত হইয়া সিংহলে প্রেরিত হয়। এই বন্দর হইতেই বুদ্ধদেবের দন্ত সিংহলে নীত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবাদ আছে যে, পুরী হইতে এই দন্ত দাতনে রক্ষিত হইয়া দাতন হইতে তামলিপ্তে নীত হয়। তাম্রলিপ্ত বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মেরই পবিত্র তীর্থ ছিল এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অর্ণবপোতে চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউঙ্-থ্-সং ও এই নগরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার বর্ণনায় বোধ হয় নগর তখনই সাগরতীর হইতে সরিয়া গিয়াছিল। তমলুকে রূপনারায়ণের কপাল-মোচন তীর্থ এককালে বিখ্যাত ছিল। ঘাটের উপরেই জিষ্ণুনারায়ণমন্দির ও নিকটেই বর্গভীমার সুপ্রসিদ্ধ মন্দির। তাম্রলিপ্ত মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়স্থান এবং কপালমোচনে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

তমোলিপ্তে মহাপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদ্গুরোঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডে নু তস্নানো দদর্শ মধুসূদনম্॥—মুরারি।

বর্গভীমার মন্দির এখনও সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়। প্রবাদ আছে যে, রূপনারায়ণের জলকল্লোল ও জলবেগ মন্দিরের নিকটে বলহীন হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সশিষ্যে এই পবিত্র তীর্থ পরিদর্শন করিয়া দ্রুতগতি দাঁতনে উপস্থিত হইলেন।

দাঁতন জলেশ্বর, পার হৈল,
উত্তরিলা গ্রামরদণ্ডে।—জয়ানন্দ মিশ্র।

দাঁতন।

দাঁতনে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ষ্টেশন ও একটী মুনসেফী আছে। ইহাও বৈদিক ও বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থান ছিল। মগধ হইতে আসিতে তৎকালে দাঁতন হইয়া তাম্রলিপ্ত যাওয়াই সুবিধাজনক ছিল। দাঁতন বা দন্তপুর জলেশ্বর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে। সম্ভবতঃ ইহা সমুদ্রযাত্রিগণের একটী বিশ্রাম স্থান ছিল। দাঁতন সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই :—জগন্নাথদেব দক্ষিণ যাত্রাকালে এইখানে তাঁহার দাঁতন (দন্তমার্জ্জন) ফেলিয়া দেন। মন্দিরে এখনও রৌপ্যের দাঁতন দেখান হইয়া থাকে। দাঁতনে শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রস্তরময় বৃষভের পাদদ্বয় কালাপাহাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দাঁতনের বিদ্যাধর দিঘী ও শশাঙ্ক দিঘী সুপ্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বালেশ্বর জেলা)

সুবর্ণরেখা।

অনতিপরেই সুবর্ণরেখা বা স্বর্ণরেখা নদী :—

"এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতদিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে॥
সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

মোটামুটি ধরিতে গেলে সুবর্ণরেখাই বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাপ্রদেশের অবচ্ছেদক। তথা হইতে উড়িয়া ভাষার প্রাদুর্ভাব ও উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনারের আধিপত্য। রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশে অনেক উড়িয়ার বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশ প্রকৃত উড়িষ্যার সহিত এক সময়ে উৎকলরাজন্যগণের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসনাধীন ছিল এবং শেষ নবাবদিগের ইহাই উড়িষ্যা ছিল।

সুবর্ণরেখাকে অবগাহনদ্বারা পবিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সুবর্ণরেখাসনাথ জলেশ্বর গ্রামে মুহূর্ত্ত মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

"মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর দেবস্থানে॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

জলেশ্বর।

জলেশ্বর মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ। গোবিন্দদাস তাঁহার কড়চায় বলিয়াছেন—

"এইরূপ নানা দেশ প্রভু করি ধন্য।
আইলা জলেশ্বরে দয়াল চৈতন্য।

বিল্বেশ্বর নাম শিব আছে জলেশ্বরে।
তাহা দেখি উছলিলা ভকতি অন্তরে॥"

"বিল্বেশ্বর" নাম অন্য কোথাও দেখিতে পাই নাই, বোধ হয় ইহা জলেশ্বরের নামান্তর। গোবিন্দদাসের লেখায় জলেশ্বরের পর সুবর্ণরেখা—

"পরদিন সুবর্ণরেখার ধারে গিয়া।
পুলকিত রঘুনাথ দাসেরে দেখিয়া॥"

জলেশ্বর মহাদেবের মন্দির দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে নির্ম্মিত। তথায় আরও অনেক দেবস্থান আছে। তথায় শিবপূজার খুব আয়োজন হইত।

"জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্যাদি অর্পণে॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

জলেশ্বরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ষ্টেশন আছে। জলেশ্বরে মহাপ্রভু রাত্রি বাস করেন মাত্র।

"এই মত জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লৈয়া॥"

ইহা একটী পুরাতন গ্রাম। এখানে পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী কুঠি বা দুর্গ ছিল; এখনও দুর্গের চিহ্ন আছে।

দাঁতনের পর জলেশ্বর ও তাহার পর সুবর্ণরেখা। কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থনিচয়ে আগে সুবর্ণরেখায় স্নান ও পরে জলেশ্বরে গমনের উল্লেখ আছে। নারায়ণগড় হইতে দক্ষিণ পশ্চিম একটী রাজপথ আছে; সে পথ বহু দিবস, এমন কি ইংরাজ আমলের পূর্ব্বাবধি, আছে। মেজর রেনেলের মানচিত্র ১৭৮১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে অঙ্কিত; তাহাতেও সে পথ দর্শিত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় রাঢ় ভ্রমণে নারায়ণগড়ের উল্লেখ আছে।

ইহাতে বোধ হয় মহাপ্রভু নারায়ণগড় হইতে দাতন, তথা হইতে প্রথমে সুবর্ণরেখায় স্নান করিয়া জলেশ্বর মহাদেব দর্শনার্থ গমন করেন এবং জলেশ্বরে রাত্রিযাপন করেন। যতদূর জানা যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যে, সুবর্ণরেখা তখনও জলেশ্বরের পশ্চিমে ছিল; কিন্তু বঙ্গদেশের অন্যান্য নদীর ন্যায় সুবর্ণরেখার গর্ভেরও পরিবর্তনের চিহ্ন অনেক আছে।

রেমুণা।

জলেশ্বর হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাশধারে (বাশদায়) একদিন থাকিয়া রেমুণায় পৌঁছিলেন,—

"হেন মতে শাক্তেন সহিত রঙ্গ করি।
আইল রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তের সাথ॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত। (খণ্ড ২)

"তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। (মধ্য ৪)

রেমুণা বালেশ্বর সহরের পশ্চিমে আড়াই কোশ দূরে, পুরী যাইবার পুরাতন রাজপথে অবস্থিত। এখানে ফাল্গুন মাসে গোপীনাথের তের দিন ধরিয়া মেলা হয়। গোপীনাথের মন্দিরও দাক্ষিণাত্য রীতিতে নির্ম্মিত। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রীত্যনুসারে মন্দিরে কারুকার্য্য; এ কালের লোকের চক্ষে অশ্লীল কারুকার্য্যেরও অভাব নাই। উৎকল প্রদেশের প্রায় সকল মন্দিরেই এই রূপ অশ্লীল কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে ও ভুবনেশ্বরের কয়েকটী প্রধান প্রধান মন্দিরে এইরূপ কারুকার্য্য আছে। ইহার কারণ কি? অনেকে বলেন যে, বজ্রাঘাত নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরে বলেন যে, বিকারহেতু বিদ্যমানেও মনোবিকার না হয় এই পরীক্ষার জন্য এইসকল

চিত্র খোদিত। তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন, তৎকালের রাজাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য চিত্রসমূহ নিবেশিত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় অশ্লীলকারু নিবেশের কারণ ইহার কোনটীই নয়। এখন আমরা যাহা অশ্লীল বলি সেকালের লোকেরা তাহাকে অশ্লীল মনে করিত না; কালবশে রুচিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে অশ্লীলতার চিহ্ন নাই; যাহা কিছু সবই বাহিরে—ঐহিক।

রেমুণার মন্দিরাভ্যন্তরে দ্বিভুজ মুরলীধর বালকৃষ্ণ অর্থাৎ গোপাল মূর্ত্তি। প্রবাদ যে মূর্ত্তি বারাণসী হইতে আনীত।

বারাণস্যামুদ্ধবেন স্থাপিতঃ পূজিতঃ পুরা।
ব্রাহ্মণানুগ্রহার্থায় তত্র গত্বা স্থিতো হরিঃ॥ মুরারি।

পূর্ব্বকালে ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব ৺বারাণসীধামে এই মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ভগবান হরি রেমুণায় গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন।

গোপীনাথের প্রসিদ্ধ নাম ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ। ক্ষীরচোরা নাম কেন? মহাপ্রভু নিজে ভক্তগণকে ক্ষীরচোরা নামের কারণ যাহা বলিয়াছেন ৺শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা এই—

"পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীর-চোরা হরি॥
* * *
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥
* *
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহা নাহি আর॥

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সারি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর॥
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুর শয়ন॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥
উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইল বাহির॥
দ্বার দিঞা গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিয়া॥

ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি পুরী গোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তারে দণ্ডবৎ কৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট ক্ষীর-চোরা নামের কথা শুনিয়াছিলেন। ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মহানন্দে অনুচরগণ সহ নৃত্য ও নাম-কীর্ত্তন করেন। নৃত্য কীর্ত্তনের সময় যে ঘটনা হয় তাহা মুরারি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"দণ্ডবদ্ ভুবি নিপত্য সুরেশং
তং প্রণম্য করুণার্দ্রমুখেন্দুঃ।
নর্ত্তনং নিজজনৈঃ সহ চক্রে
কীর্ত্তনং সরসিজায়তনেত্রঃ॥
তৎক্ষণং মুররিপোঃ প্রতিমায়া
মৌলিলগ্নমুকুটং চ পপাত।
তৎ বিলোক্য করপদ্মযুগেন
উদ্দধার শ্রীশচীসুত এষঃ॥"

পদ্মপলাশলোচন মহাপ্রভু ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া পারিষদগণের সহিত নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখচন্দ্র করুণরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভগবৎপ্রতিমার শিরঃস্থিত মুকুট তৎক্ষণেই বিচ্যুত হইল এবং শচীতনয় তদ্দর্শনে করকমলদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক তাহা ধারণ করিলেন।

কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন—

"প্রভোঃ শীর্ষে শীর্ষাদপি ভগবতস্তস্য চলতঃ।
প্রসূনানাং চূড়া ন্যপতদখিল পশ্যতি জনে॥"

ভগবানের মস্তক স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং সকল লোকেই দেখিল ভগবানের মস্তক হইতে পুষ্পময়ী চূড়া প্রভুর মস্তকে নিপতিত হইল।

মহাপ্রভু "মহাপ্রসাদ ক্ষীরের" লোভে ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের মন্দিরের নিকট এক রাত্রি যাপন করেন।

অধুনা বালেশ্বরের মহারাজা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের ও তাঁহার পিতার ব্যয়ে ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের মন্দিরের জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। বালেশ্বর হইতে রেমুণায় যাওয়ার পথ নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু তাহারও কিছু সংস্কার আবশ্যক।

নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ভিক্ষাবলম্বী। তাঁহার অনুচরবর্গও নিঃসম্বল। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ অনুগামী। তাঁহারা এখনকার সাধারণ সন্ন্যাসী বা গৃহি-ভিক্ষুকগণের ন্যায় ছিলেন না। তাঁহাদিগের জীবনযাত্রার নিমিত্ত চিন্তা ছিল না। দিনযাত্রার জন্য তাঁহারা ভাবিতেন না; আহারেরও লোভ ছিল না। মহাপ্রভু নিজে যে ভাবে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের যাত্রী হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় "মুরারিমুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি মনোহর" অতি বিষদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"গচ্ছন্ কচিদ্‌গায়তি কৃষ্ণগীতং
কচিদ্বদত্যর্থমলব্ধসংজ্ঞম্।
কচিদ্দ্রুতং যাতি শনৈঃ কচিৎ স্খল-
দ্গতিঃ কচিৎ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ॥"
সায়ং কচিদ্ ভক্ষ্যামুপস্থিতং ভবে-
ত্তদন্নমশ্নাতি হরির্যথাবিধি।
রাত্রৌ চ গায়ত্যথ রোত্যধৈর্য্যং
বিসৃজ্য দেবো মহতীং সুপায়॥

তিনি যাইতে যাইতে কখনও কৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিলেন, কখনও উন্মত্তভাবে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, ভাবে বিভোর হইয়া কখনও বা দ্রুতপদে ধাবিত হইতে লাগিলেন, কখনও বা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, কখনও চলিতে চলিতে তাঁহার পদস্খলনও হইতে লাগিল; সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাকালে কোথাও হয়ত তাঁহার নিকট কিছু খাদ্য উপস্থিত হইত, এবং তখন তিনি ভোজনবিধি প্রতিপালন করিয়া তাহা খাইতেন। পরে রাত্রিতে অধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ লাভমানসে হরি নাম গান করিতেন।

তাঁহার মুখে অনুক্ষণ স্বরচিত শ্লোক—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

হে রঘুনন্দন রামচন্দ্র, হে রঘুনন্দন রামচন্দ্র, হে রঘুনন্দন রামচন্দ্র, আমায় রক্ষা কর; হে কেশব কৃষ্ণচন্দ্র, হে কেশব কৃষ্ণচন্দ্র, হে কেশব কৃষ্ণচন্দ্র, আমায় রক্ষা কর।

তাঁহার চিন্তা কৃষ্ণপ্রেম। তাঁহার শিষ্যগণের চিন্তা তাঁহাকে; তাঁহাদিগের অন্য কোন চিন্তাই ছিল না। হরিনামামৃতই তাঁহার ও শিষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক সম্বল। রেমুণায় তাঁহার "মহাপ্রসাদ ক্ষীরের" লোভ হইয়াছিল; কিন্তু সে লোভ ক্ষীরের জন্য নহে, মহাপ্রসাদের জন্য। ভক্তের ভক্তিসূচক লোভ, আহারের লোভ নহে।

বালেশ্বর।

রেমুণা হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে গোবিন্দদাসের কড়চায় হরিপুর, বালেশ্বর ও নীলগড়ের নাম উল্লেখ আছে। তিনটী স্থানই পুরী যাইবার পথে; তন্মধ্যে বালেশ্বর এখন একটী বড় সহর। এখন তথায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশন। সহরে প্রসিদ্ধ ঝাড়েশ্বর শিব মন্দির। বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল না।

ইউরোপীয় বণিকসকলের ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আবির্ভাব হওয়ায় বালেশ্বরের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানে সমুদ্রযানোপযোগী ছোট ছোট জাহাজ প্রস্তুত হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা লবণের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এখনও ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের কুঠির চিহ্ন আছে; কিন্তু লিভারপুলের লবণের প্রাদুর্ভাবে এখন আর বালেশ্বরে লবণ হয় না; প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যের লোপ হওয়ায় বালেশ্বরের আর গৌরব নাই। উড়িষ্যা প্রদেশের সমুদ্রতীরে বিস্তর লবণ প্রস্তুত হইত, বালেশ্বরে বিস্তর লবণের গোলা ছিল। এখন লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ। ইহাতে তৎ তৎ প্রদেশের ও পূর্ব্ব ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(কটক জেলা)

যাজপুর।

যাজপুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর। ইহা এক সময়ে পৌরাণিকদিগের ও বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থান ছিল এবং ইহা তৎপরে শৈব-কেশরী রাজাদিগের উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এখন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই স্থানে চতুর্ম্মুখ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়া বেদোদ্ধার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম যজ্ঞপুর এবং যজ্ঞ বা যাজ শব্দ হইতে যাজপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রাজা যযাতিকেশরীর নামেই যাজপুরের নামকরণ হইয়াছে। যাহা হউক, তথায় এককালে দশ হাজার ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।

বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই হিন্দু বা আর্য্যধর্ম্মের অন্তর্গত। জৈন ধর্ম্মও আর্য্যধর্ম্মের শাখা বিশেষ। ভারতবর্ষীয় বৈদিক ধর্ম্মই আদিম ও সনাতন, কিন্তু এই তিনটী পুরাতন ধর্ম্ম এক বৃহৎ বটবৃক্ষের শাখা স্বরূপ বহুকাল গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণ প্রদেশে প্রচলিত ছিল। জৈন ধর্ম্ম এখনও অক্ষুণ্ণভাবে পূর্ব্ববৎ প্রচলিত আছে, কিন্তু বৈশ্যদিগের মধ্যেই ইহার বিশেষ বিস্তার। কোন ব্রাহ্মণ জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হয়েন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম পঞ্চশত বর্ষাধিক ভারতবর্ষে দেদীপ্যমান থাকিয়া লুপ্তপ্রায় হয়, কিন্তু ইহা কখনই ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। উত্তরে ও পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে এখনও ইহা প্রচলিত। গ্রেটব্রিটেন্-শাসিত ভারতবর্ষেই ৬০,০০০ বৌদ্ধ। নেপালেও অনেক বৌদ্ধ আছে, বস্তুতঃ অনেক বিষয়েই বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভেদ ছিল না। বৌদ্ধ নাম না থাকিলেও বৌদ্ধসূত্রসমূহ এখনও প্রচলিত। বস্তুতঃ মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও

বৈদিক হিন্দুদিগের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ ছিল, আর ভারতবর্ষে মহাযান মতই প্রচলিত ছিল। যাজপুর দ্বিজভূমি ছিল অর্থাৎ তথায় অনেক দ্বিজ বাস করিতেন। বৌদ্ধ কেহ ছিল না, এ কথা বলা যায় না; বৌদ্ধধর্ম্ম রূপান্তর ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। পরন্তু কেশরী রাজগণের রাজত্বের পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধগণের সংখ্যা বিলক্ষণ বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয়। বৈদিক ধর্ম্মের বহুলপ্রচার ও দশসহস্র ব্রাহ্মণের বাসের প্রভাবে মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ অনেকেই বৈদিক ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। উভয় ধর্ম্মের প্রভেদ সামান্য থাকায় বৈদিক ধর্ম্ম পুনরবলম্বন অতি সহজ ছিল। রাজা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহজেই প্রাধান্য হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ যাজপুরে, এমন কি উড়িষ্যায়, বৌদ্ধমতের প্রকাশ্য ভাবে লোপ হইয়াছিল। বুদ্ধের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর পূজা ক্রমশঃ লোকের অবলম্বন হইয়াছিল। বুদ্ধের বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-মূর্ত্তিতে ক্রমশঃ পরিণত হইয়াছিল। অন্ততঃ কেশরী ও গঙ্গবংশীয় রাজগণ ও তাঁহাদিগের বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাসমূহ বৌদ্ধ মূর্ত্তিসমূহের অঙ্গচ্ছেদ করিতেন না, অবমাননা করিতেন না। ক্রমশঃ বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি সমূহের অভেদ হইয়া সমস্তই বৈদিক ও পৌরাণিক দেব দেবীর মূর্ত্তিস্বরূপ পূজিত হইতেছিল। বৌদ্ধ মন্দির ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমন্দিরের ভেদ ছিল না। কিন্তু এখন সমস্ত মন্দির ও দেবমূর্ত্তিসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। তখনকার যাজপুরের চিত্র মনে করিলে এখনকার যাজপুরের চিত্র হৃৎকম্পের উদ্রেক করিয়া থাকে।

এখনও যাজপুরে বহুতর ব্রাহ্মণের বাস, এখনও ইহা "দ্বিজভূমি"। তজ্জন্যই বৃন্দাবন দাস যাজপুরকে "ব্রাহ্মণনগর" বলিয়াছেন। যাজপুর সম্বন্ধে জয়ানন্দ মিশ্র বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মার পাট, যাজপুর নগর,
পাপহরা নদীর কূলে।
আপনি ভগবান, যাহে অধিষ্ঠান,
হরি বরাহ দেউলে॥

ব্রহ্মার শাসন ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট,
ব্রহ্মদেশে অশ্বমেধ কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি, না যায় যমের পুরী,
কুক্কুর চতুর্ভুজ হইল॥
যাজপুর রম্যস্থান, হরি বরাহ অধিষ্ঠান,
পাপহরা নদী সন্নিহিতে।
অযুত নিযুত শত, ব্রহ্ম বৈসে কত কত,
ব্রহ্মার শাসন চারিভিতে॥
আদ্যাশক্তি বিরজা, ব্রহ্মার করিলা পূজা,
নাভিগয়া দেউল ঈশানে।
সর্ব্বতীর্থ ফল পাই, স্মরণে বৈকুণ্ঠে যাই,
বিরজার মুখ দরশনে॥
লবণ-সমুদ্রকূলে, জগন্নাথ নীলাচলে,
ব্রহ্মা রহিলা যাজপুরে।

যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাজপুরে উপস্থিত হন, তখন যাজপুর হিন্দু নগর, হিন্দুরাজশাসিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে যাজপুরে পরিভ্রমণ করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, যে যাজপুরের "লিঙ্গশত" ও দেবমন্দিরসমূহ পরিদর্শনার্থ তিনি শিষ্য ও অনুচরবর্গকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিয়ৎক্ষণ অদৃশ্য হইয়াছিলেন, কেশরী-বংশের সে রাজধানীর গৌরব, সে দেবমন্দিরশ্রেণী ও দেবমূর্ত্তিসমূহ এখন অদৃশ্য হইয়াছেন।

প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমনের সহিত যাজপুরের শোভা অস্তাচলাভিমুখী হইয়াছিল। বহুপূর্ব্ব হইতেই মহানদী ও কাটজুড়ির অন্তর্বর্ত্তী কটক সহর উড়িষ্যার রাজাগণের রাজধানী হইয়াছিল; কিন্তু তখনও ব্রহ্মার যজ্ঞপুর, পবিত্র বিরজাক্ষেত্র, উৎকলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নগরস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। প্রতাপরুদ্রের অমিততেজঃ প্রভাবে মুসলমান জয়স্রোতঃ উড়িষ্যায় কিছুকালের নিমিত্ত প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল; এমন কি তাঁহার চতুরঙ্গ বল ভাগীরথীর শুভ্র

সলিলে অবলীলাক্রমে লীলা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গঙ্গবংশের লোপের পর তাঁহাদিগের মন্ত্রিবংশ চতুস্ত্রিংশৎ বর্ষকাল উৎকল প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্গের স্বাধীন নবাব সলিমানের সৈন্যাধ্যক্ষ কালাপাহাড় ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটেই পরাভূত ও নিহত করিয়া উৎকলে হিন্দুরাজ্যের লোপ করিয়াছিল।

কালাপাহাড় এককালে আর্য্যধর্ম্মী ছিল ও পরে আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মের লোপের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সহস্রাধিক দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিজয়িগণ বিভগ্ন ও বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। এখনও অসংখ্য শৈবমন্দিরের, অসংখ্য ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; এখনও যাজপুরে উড়িষ্যাবাসীদিগের ভাস্করকার্য্যের নিপুণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু এখন সে পুরাতন গৌরবজ্যোতিঃ কোথায়? মুসলমানদিগের জয়স্রোতে, অনিবার্য্য সময়স্রোতে, কোন কোন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর অবিবেচনায়—বহু কারণে অনেকেই নষ্ট হইয়াছে। ১৫১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যাজপুর উৎকল প্রদেশের সুসভ্যতার কীর্ত্তিস্বরূপ থাকিয়া আফগানদিগের আর্য্যধর্ম্মবিদ্বেষের কুঠারাঘাতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

এরূপ দশ সহস্র ব্রাহ্মণের বাস কোথাও ছিল না।—এখনও নাই। এখনও যাজপুরের অধিকাংশ বাসিন্দা ব্রাহ্মণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে দেবভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন, এখন সেই শিবভক্তির স্মৃতিচিহ্ন মাত্র ভগ্নমন্দিরসমূহে বিদ্যমান আছে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন ঃ—

"লক্ষ লক্ষ বৎসরেও নারি লিতে সব নাম।
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান ॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম ॥

চৈতন্যভাগবত খণ্ড।

বৈতরণীতে অবতরণ ও অবগাহনের ঘাটসমূহ প্রায়ই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; কেবল দশাশ্বমেধ-ঘাট নবগ্রহের মূর্ত্তির সহিত এখনও হিন্দু পাপিগণের উদ্ধারের জন্য পাপহরা বৈতরণীতে অবতরণের নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। এখন দেবমূর্ত্তিসমূহের অবস্থা দেখিলে মুসলমান বিজয়ীদিগের উপর বিরক্তির উদ্রেক হয়। কোথাও দেবমূর্ত্তি শয়ান, কোথাও বনমধ্যে সামান্য প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় রহিয়াছে; অধিকাংশ দেবমূর্ত্তির নাসিকাছিন্ন, হস্তপদাদি অনেকেরই ভগ্ন। মুসলমানেরা বৈদিক পৌরাণিক বা বৌদ্ধ মূর্ত্তির প্রভেদ করিত না। কথিত আছে যে, মুসলমানগণ হিন্দুদেবালয়সমূহ গোশালা ও অশ্বশালার স্বরূপে ব্যবহার করিত এবং অপূর্ব্ব ভাস্করময় দেবমন্দিরের প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তাহাদিগের প্রাসাদ ও কবরস্থান নির্ম্মাণ করিত। এখনও হিন্দুমন্দিরের প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত মস্‌জিদ্ তাহাদের রুচি ও প্রবৃত্তির প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। মুসলমানদিগের বিদ্বেষভাব বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয়েরই প্রতি সমানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখনও অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান যজ্ঞবরাহ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা, ঠিক বলিতে পারা যায় না। প্রতাপরুদ্র যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও তাহাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটস্থ রাজপ্রাসাদ ভগ্ন হইয়াছে; কেবল ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈতরণীর অপর পারের পরিবর্ত্তন অত্যধিক। যাজপুর ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীতে মুসলমান ও উৎকলবাসী হিন্দুদিগের বিগ্রহক্ষেত্র ছিল; যাজপুর যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অনেক স্থানে অনেক লোকের এককালে বসতি ছিল, এখন সেখানে বসতিচিহ্ন নাই; আবার অনেক স্থান এখনও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মন্দির, ব্রাহ্মণনিবাস ও প্রভূত নারিকেলবৃক্ষশ্রেণী। এখনও যাজপুরের পবিত্রতা, বৈতরণীর মাহাত্ম্য ও বিরজাদেবীর গরিমা যাজপুরের ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করিতেছে। গরুড়স্তম্ভে গরুড় না থাকিলেও ইহা অপূর্ব্ব।

যাজপুরে পৌছিয়া মহাপ্রভু সশিষ্য দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিলেন। ইহা দেবনদী পাপহরা বৈতরণীর বামদিকে। বর্ত্তমান যাজপুর গ্রাম বা সহর নদীর অপর পার্শ্বে। ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ ঘাটেই দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।* পবিত্র নদীর পবিত্র ঘাটে গৃহীর পিতৃতর্পণ কর্ত্তব্য। প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটের পৈঠায় নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত। উপরেই বরাহক্ষেত্র। দক্ষিণ দিকে কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির। বামদিকে ও কয়েকটী ক্ষুদ্র মন্দিরে ক্রান্তিদেবী প্রভৃতি বিদ্যমানা। সর্ব্বোপরি যজ্ঞবরাহের মূর্ত্তি ও মন্দির এবং যজ্ঞবরাহই যাজপুরের প্রসিদ্ধির ও পবিত্রতার বিশেষ কারণ। নদী হইতে কয়েক হস্ত দূরেই এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে নির্ম্মিত; অবয়ব ও উচ্চতায় ইহার বিশেষ আকর্ষণ শক্তি নাই, কিন্তু গর্ভগৃহে যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তি; ইহা কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত। এক পার্শ্বে শ্বেতবরাহ; অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী ও জগন্নাথদেব। গর্ভ গৃহের সম্মুখে জগমোহন মণ্ডপ এবং তাহাতে স্তম্ভোপরি গরুড়-মূর্ত্তি। মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরময় চত্বর। এই চত্বরে বসিয়া বৈতরণী শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধান্তে তথায় সমন্ত্র গোদান ও গোপুচ্ছ ধারণ করিতে হয়। তথায় সমন্ত্র গোদান করিলে মৃত্যুর পর যমদ্বারে তপ্ত বৈতরণী নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়। প্রাঙ্গণের নিকটে "ধর্ম্মবট" নামে খ্যাত বট বৃক্ষ। চারি-দিকেই পবিত্রতা।

স্নান করিয়া চৈতন্যদেব যজ্ঞবরাহ দর্শন করিলেন—

"তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ২

যজ্ঞবরাহ দর্শনান্তর তিনি একাকী যাজপুর প্রদক্ষিণ করিলেন। এখন সে যাজপুর নাই। সার্দ্ধ পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত মহিষা-সনা কঙ্কণকেয়ুর-কুন্তলাদি-অলঙ্কার-ভূষিতা বারাহী এখন আর নিজ মন্দিরা-

---

* মহাভারতের বনপর্ব্বে (অধ্যায় ১) কথিত আছে যে, ধর্ম্ম এখানে যজ্ঞ করেন—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোপি দেবস্থরণমেত্য বৈ॥"

ত্যক্তব্যা নহেন। তাঁহার মুসলমানস্পৃষ্ট, মুসলমান-করবাল-বিশ্লিষ্টাঙ্গ ক্লোরাইট প্রস্তর-নির্ম্মিত তনু, এখন যাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাস বাটীর প্রাঙ্গণ শোভিত করিতেছে। এখনও শ্রীপাদদ্বয়ে উৎকল প্রথার নূপুর মল দৃশ্যমান, বামাঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুরীয়ক, বক্ষে হার দোদুল্যমান, কটিদেশে চন্দ্রহার, নিম্নাঙ্গ বস্ত্রাবৃত; অঙ্গহীন ক্রোড়স্থ বালক এখনও যেন জীবন্ত। সহস্র বৎসরের সূর্য্যরশ্মি ও বারিবর্ষণ সে মূর্ত্তির কিছুই করিতে পারে নাই, কেবল মুসলমান-করবাল-ক্ষতচিহ্ন দেদীপ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহীর অক্ষত মূর্ত্তিকে কোন্ মন্দিরে দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপায় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই প্রাঙ্গণেই বরাহীর নিকটে প্রেতসংস্থা চামুণ্ডা-মূর্ত্তি; ইহাও একখণ্ড দীর্ঘায়তন ক্লোরাইট প্রস্তর হইতে খোদিত। চতুর্বাহুসমন্বিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরা, অতিদীর্ঘা, অতিভীষণা, শুষ্কমাংসা, অতিভৈরবা, মুণ্ডমালা-ধৃতা, করালবদনা, কবন্ধবাহনা, নরমালা-বিভূষিতা, চামুণ্ডা এখনও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। শিরোদেশে সর্প, পদতলে ভৈরব, সেই চামুণ্ডাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাজপুরের কোন্ মন্দিরে পূজিতা হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা এখন কেহই বলিতে পারে না।

অস্থিচর্ম্মাবশেষ মৃত্যুরূপিণীর সম্মুখেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না, গজ-সমারূঢ়া, সৌম্যমূর্ত্তি, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ইন্দ্রাণী। ইনিও ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত; ইনিও সার্দ্ধ পঞ্চহস্ত পরিমিত। কটিদেশ কটিবন্ধ আবরণ বস্ত্রকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। অশেষ মণিমুক্তা পরিধানের চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান। ক্রোড়দেশে বালক এখনও যেন ক্রীড়া করিতেছে। মাতৃকা নিজেও যেন বালমূর্ত্তি ক্রোড়ে করিয়া আনন্দোৎফুল্লা। এরূপ সুন্দর মূর্ত্তিতেও মুসলমানের শরাঘাত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। এখন যদি চৈতন্য মহাপ্রভু ইহাকে এই অবস্থায় দেখিতেন, তাঁহার চক্ষের জলে পৃথিবী বর্ষার জলের ন্যায় আর্দ্র হইয়া যাইত। এ মূর্ত্তিতে অস্ত্রাঘাত কুরুচির পরাকাষ্ঠা।

এই সৌম্য মূর্ত্তির নিকটেই ভগ্নপাদ শান্ত-মাধব। ইনি এককালে

বৌদ্ধদিগের পূজার্হ পদ্মপাণি ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগণ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পূজা করিতেন। ইঁহার দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রোডস্ দ্বীপে কলোসাসের কথা পড়িয়াছি; শান্ত-মাধবের ভগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সেই কথা স্মরণ হয়। যে স্থানে পূর্ব্বোক্তা চারিটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থান ব্যক্তিমাত্রেরই দ্রষ্টব্য। যাজপুরে এখনও অনেক এরূপ মূর্ত্তি আছে। বনেও এখন অনেক দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে এরূপ কত শত মূর্ত্তি যাজপুরে বর্ত্তমান ছিল কে বলিতে পারে?

বৈতরণীর তীরেই একটি প্রশস্ত গৃহমধ্যে অষ্টমাতৃকাদিগের মূর্ত্তি রহিয়াছে। তথায়ও, বারাহী, চামুণ্ডা ও ঐন্দ্রীর মূর্ত্তি আছে। সে সমুদয়ও মুসলমান-তরবারি-ক্ষত। তথায় আরও পাঁচটী মাতৃকামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী ও কৌমারী। এখন তাঁহারা যমের স্ত্রী, যমের মাতা, যমের মাসী, যমের পিসী ও যমরাজ নাম ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহারা কিরূপে তথায় আসিলেন, কোথায় তাঁহাদের পূর্ব্বে পূজা হইত, এখন তাহা বলিবার কেহই নাই। ইঁহারাও ক্লোরাইটপ্রস্তর খোদিত চতুর্হস্ত-বিশিষ্টা ও সর্ব্বাভরণবিভূষিতা। নিকটেই জগন্নাথ দেবের মন্দির; বলরাম ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথ বিরাজমান। মন্দির প্রভৃতি পুরীর মন্দিরের ছায়ায় নির্ম্মিত,—সেইরূপ সিংহদ্বার। নিকটেই গণপতিমূর্ত্তি; ইনিও মুসলমান-স্পৃষ্ট, কিন্তু এখনও ইঁহার পূজা হইতেছে।

যজ্ঞবরাহের পরই বিরজাদেবী যাজপুরের পবিত্রতার কারণ, বিরজাদেবীর মন্দির কেশরীরাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত। দেবী স্থান ৫১ পীঠের মধ্যে একটি। মূর্ত্তি অষ্টভুজা, থর্ব্বাকৃতি, অষ্টাদশ অঙ্গুলিপরিমিতা; শক্তিস্বরূপা।

তাঁহার ধ্যানেই মূর্ত্তির বর্ণনা—

শ্রীশ্রীবিরজাদেবীর ধ্যান।

শ্যামাঙ্গীং সিংহমারূঢ়াং দ্বিভুজাং শূলধারিণীং
বিভ্রতীং বামহস্তেন মহিষাসুর পুচ্ছকম্।

সুরাসুরৈর্ব্বন্দ্যমানাং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্
সর্ব্বাভরণসম্পন্নাং ভক্তানুগ্রহকারিণীম্
বন্দে শ্রীবিরজাদেবীং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনীম্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিরজা-ক্ষেত্রে যাইয়া বিরজাদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

স জগাম বিরজামুখপদ্ম-
দর্শনায় ভগবান্ করুণাব্ধিঃ।
যাং বিলোক্য জগতাং জন্মকোটি
মাত্রমঘং হ্যখিলং প্রজহাতি॥

(মুরারি)

যাঁহার দর্শন মাত্রে জগদ্বাসী কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়, কৃপাপারাবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই বিরজা দেবীর মুখকমল দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।

মুরারি আরও বলিয়াছেন :—

ভগবদ্দর্শনে যাদৃক্ ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
তাদৃক্ ফলমবাপ্নোতি বিরজামুখদর্শনে॥
বারাণস্যাং মৃতে যাদৃক্ প্রীতিমাপ্নোতি শঙ্করঃ।
ততোঽধিকতরা প্রীতির্বিরজায়াং মৃতে ভবেৎ॥

মানবগণ শ্রীভগবান্ চন্দ্রকে দর্শন করিয়া যাদৃশ পুণ্যের অধিকারী হয়, বিরজামাতার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে অধিকারী হয়। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে মৃত প্রাণীর প্রতি প্রীত হইয়া ভগবান্ আশুতোষ তাহার পরলোকগত আত্মার যাদৃশ গতিবিধান করেন, এই বিরজা ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর প্রীত হইয়া ভগবান্ ভূত ভাবন তাহার সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর উপায় বিধান করেন।

এখনও মন্দির অক্ষত রহিয়াছে। প্রস্তরের উপর প্রস্তর, কেশরী রাজগণের আদেশে যেরূপ বিনিবেশিত হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ আছে।

প্রাঙ্গণ প্রাচীরবেষ্টিত। ঐ প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা ইহার জীর্ণ সংস্কার হইতেছে। প্রবেশদ্বারে অনেক দেবমূর্ত্তি ও বুদ্ধের মূর্ত্তিও রহিয়াছে।

বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকটেই নাভিগয়া। প্রবাদ আছে গয়াসুরের মস্তক গয়ায় পড়িয়াছিল, তথায় বিষ্ণুর পাদপদ্ম। যাজপুরে গয়াসুরের নাভি-দেশ পড়িয়াছিল, তথায় বিষ্ণুর গদা রহিয়াছে। নাভি-গয়ায় পিতৃ-পিণ্ডদানে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

"উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।"

(তন্ত্রচূড়ামণি)

উৎকলে নাভি দেশেরও বিরজাক্ষেত্র আখ্যা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্ত ছিলেন; তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না। বিদ্বেষ-ভাব থাকা দূরে থাকুক; তিনি শক্তিমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তিনি শক্তিরূপিণী বিরজামূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়াছিলেন।

তাং বিলোক্য প্রণমন্ সমযাচত
প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ।
আজগাম গয়নাভিমনর্ঘ্যং
পৈত্রতীর্থমরবিন্দমুখেশঃ॥"

(মুরারি)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিরজা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃ-সর কৃতাঞ্জলিপুটে অতুলনীয় প্রেম ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। পরে পিতৃ-লোকের প্রীতিসাধন মানসে পিতৃতীর্থ নাভিগয়ায় উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মকুণ্ডপয়সি দ্বিজবর্য্যৈঃ
স্নানমাশু বিদধে বিধানবিৎ।
যত্র যজ্ঞবরাহপ্রকাশ-
দর্শনেন জগতাং সুখমাসীৎ॥"

(মুরারি)

যে পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড সলিলে যজ্ঞবরাহরূপের বিকাশ অবলোকন করিয়া জগতের অধিবাসিগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, নিখিল বিধানবেত্তা ভগবানচন্দ্র সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণগণসহ তৎক্ষণেই তাহাতে স্নান করিয়াছিলেন।

বিরজা বাপীর জলও পবিত্র। বিরজা বাপীর অপর নাম ব্রহ্মকুণ্ড, ইহা গজগিরিপুষ্করিণী।

যাজপুরে প্রায় ২০ হাত উচ্চ একটি গরুড়স্তম্ভ আছে। ইহাকে এক্ষণে শুভস্তম্ভ বলে। ইংরাজ পূর্ত্তবিভাগ হইতে ইহার সংস্কার হইয়াছে। যাজ-পুরে প্রবাদ ঐ স্তম্ভ স্বয়ং ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপিত। ইহাও প্রবাদ যে ইহার ভিতরে স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমুক্তাদি ছিল; তাহা এক সন্ন্যাসী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। গরুড়স্তম্ভ আর্য্যদিগের দ্রষ্টব্য কীর্ত্তি।

বিরজা মন্দিরের অনতিদূরে মণিকর্ণিকা ঘাট। মহাবিষ্ণু সংক্রান্তিতে এখানে যাত্রা মহোৎসব হয়। এগারনালা পুরাতন হিন্দুদিগের অপর একটী কীর্ত্তি। পুরীর নিকটে রাজবর্ত্মে আঠারনালা; এখানে এগারটী নালা থিলান করা জলপ্রণালী। কালস্রোত এই নালা সকলের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিষ্য ও সেবকগণের নিকট অদৃশ্য হইয়া একাকী যাজপুরে মন্দির ও দেবমূর্ত্তিসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

> "বভ্রাম তত্র ভগবান্ নগরীং নিরীক্ষ্য
> ভূতেশলিঙ্গমবলোক্য মহানুভাবঃ।
> বারাণসীমিব সদাশিবরাজধানীম্
> যত্র ত্রিলোচনমুখাঃ শিবলিঙ্গকোটিঃ॥" —মুরারি

যে যাজপুর নগরে "ত্রিলোচন" প্রভৃতি কোটিসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিরাজমান, যে পুরী ভগবান্ ভবানীপতির চিরাধ্যুষিত বারাণসীর তুল্য, মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সেই নগরীর মনোহর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রমণকালে "ভূতেশলিঙ্গ" সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন।

যাজপুর এখন সবডিভিজান এবং এখানে মুন্সেফীও আছে, কিন্তু যাজপুরের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা। রেলওয়ে বিস্তারের পূর্ব্বে পুরীর তীর্থযাত্রীদিগকে যাজপুর হইয়া যাইতে হইত; এখন যাজপুর যাজপুররোড রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দূরে; পুরীর যাত্রিগণ কেহই সহজে যাজপুরে যান না। যাতায়াতেরও যথেষ্ট কষ্ট। যাজপুরের পাণ্ডাদিগের বৃত্তির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যাজপুরের ঐশ্বর্য্যেরও হ্রাস হইবে। হয়ত কিছুকাল পরে মুসলমানগণ যাহা নষ্ট করেন নাই, সময়স্রোত তাহার লোপ করিবে। ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাহায্য ব্যতীত যাজপুরের আর্য্যকীর্ত্তি রক্ষা অসম্ভব হইবে।

কটক।

যাজপুরে একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভু সশিষ্য কটকনগরে গমন করেন। কটক মহানদী ও কাঠ্‌জুড়ীর অন্তর্বর্ত্তী, রাজধানীর বিশেষ উপযুক্ত স্থান। প্রতাপরুদ্র প্রায়ই তথায় বাস করিতেন এবং তাঁহার অধিকাংশ চতুরঙ্গবল তথায় থাকিত। রাজা নৃপকেশরী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দিতে সহর নির্ম্মাণ করাইয়া রাজধানী করেন; ইহার পূর্ব্বে ভুবনেশ্বর কেশরী-রাজন্যগণের রাজধানী ছিল। কাঠ্‌জুড়ীর লেটারাইট প্রস্তরের রিভেটমেণ্ট (প্রাচীর বা বাঁধ) প্রাচীন কেশরীরাজদিগের একটী অপূর্ব্ব পূর্ত্তবিভাগের কীর্ত্তিস্তম্ভ। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় তাহা অক্ষত ছিল। এখনও কাঠ্‌জুড়ীর জলবেগ ও সময়স্রোত তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। এই বাঁধ দৈর্ঘ্যে একক্রোশের উপর; মধ্যে মধ্যে স্নানের ঘাট আছে। এই রিভেটমেণ্ট দ্বারা কটকনগর

মহানদীর জলপ্লাবন হইতে রক্ষিত হয়। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও ভারতবাসীদিগের কি শিল্প নৈপুণ্য ছিল!

কটক রাজধানীতে কেশরী বা গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের ধর্ম্মকীর্ত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা যাজপুরে, বিষ্ণু পুরুষোত্তমে, মহেশ্বর ভুবনেশ্বরে ও সূর্য্যদেব কোণার্কে আধিপত্য করিতেছিলেন। কটক নগর কেবল প্রজা শাসনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবও তথায় গমন করিয়াছিলেন মাত্র। রাজপথ দিয়া পুরী যাইতে কটক অপরিহার্য্য। জয়ানন্দ মিশ্র কবিকর্ণপূর কটকের নাম করিয়াছেন—

"রাজরাজেশ্বর কটক দেখিঞা"

* * *

"হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কতদিনে কটক নগর॥
ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান॥"

কথিত আছে মহাপ্রভু ভাগ্যবতী মহানদীতে গড়গড়া ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। ঐ ঘাট কটকের দুর্গের নিকটে। প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের উপরেই শিবমন্দির—গড়গড়া শিব। কটকবাসিগণ ঐ ঘাট পবিত্র মনে করেন।

কটকের দুর্গ এককালে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব ইহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার অভ্যন্তরে দেবমন্দিরাদিও ছিল। গড়টী দ্রষ্টব্য ও প্রবেশদ্বার এখনও অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশলের পরিচয় দিতেছে। "আইন-ই-আকবরিতে" লিখিত আছে যে, দুর্গের ভিতরে রাজা মুকুন্দদেবের অতি সুন্দর সপ্ততল প্রাসাদ ছিল। এখন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অদম্য কাল প্রভাব অথবা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অসভ্য কোন দুরাত্মা সেই প্রাসাদকে ভূমিসাৎ করিয়া প্রস্তর খণ্ডসমূহ পর্য্যন্ত চক্ষুর অন্তরালে লইয়া গিয়াছে।

কটক। হইতে মহাপ্রভু রাজপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে পথে সৈনিকগণের কোলাহল, অশ্বগণের হ্রেষারব বা তরবারির আঘাত-শব্দ ছিল না। মুসলমান বঙ্গীয় নবাবের সৈন্য তখন অতদূর যাইতে পারে নাই। যাজপুরের দক্ষিণে প্রতাপরুদ্রের শাসন প্রায়ই শত্রুশূন্য ছিল। কটক তাঁহার প্রধান দুর্গ, কিন্তু কটকের দক্ষিণে মুসলমান শত্রু তখনও বিশেষ কোন উৎপাত করিতে পারে নাই। তথা হইতে পুরী পর্য্যন্ত প্রদেশ তখন শান্তিময় ছিল। তথায় এখনও লক্ষ্মী বিরাজমানা, তখনও তাহাই ছিলেন। যেন অন্নপূর্ণা বারাণসী ধাম ত্যাগ করিয়া গুপ্তকাশী একাম্রকাননের ও বিষ্ণুর প্রিয়তম স্থান পুরুষোত্তমের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ শত শত বৎসর কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিতেছেন। রাজপথের উভয়পার্শ্ব শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রসমূহ। বন নাই, জঙ্গল নাই; কোথাও অনুর্ব্বরা ভূমি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে দেবমন্দির, সরোবর ও সরোবরের মধ্যে ক্ষুদ্রদ্বীপেও দেবার্চ্চনা স্থান। যেখানে ধান্যক্ষেত্র নাই, সেখানে বহুফলধারী নারিকেল বৃক্ষরাজি; তাল, খর্জ্জুর, সহকার ও পুন্নাগ বৃক্ষশোভিত বাগান। বাগানে কেতকীর বেড়া, আর যেখানে সেখানে কেতকীর ঝোপ। বস্তুতঃ যাজপুর হইতেই কেয়াগাছের ঘটা। মহাপ্রভুর সময়েও বোধ হয় "কালহাড়ী, কেয়াগাছ, তবে জানবে জগন্নাথ" কথা প্রচলিত ছিল। কেয়াগাছ বহুকালাবধি বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমকূলের শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। মহাকবি কালিদাস বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের মুখদ্বারা বলিয়াছিলেন—

"বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে,
সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি ॥

—রঘুবংশঃ।

হে আয়তলোচনে সরিৎপতির তীরসঞ্চারী সমীরণ কেতকীকুসুম পরাগ দ্বারা তোমার বদনমণ্ডল মণ্ডিত করিতেছে।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি অনুচর সহ মহাপ্রভু এই মনোহর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমনান্তর "সাক্ষিগোপালে" উপনীত হইলেন। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় বোধ হয় যে, মহাপ্রভু "সাক্ষিগোপাল" দর্শনানন্তর ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বর হইতে কমলপুরে যান। তাঁহার পরবর্ত্তী চরিতামৃত লেখকগণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দ মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন—

"ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান॥"

—বৃন্দাবন দাস।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গোপাল দর্শনের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

ভুবনেশ্বরে পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন॥

জয়ানন্দ মিশ্রও লিখিয়াছেন—

রাজরাজেশ্বর, কটক দেখিঞা,
সাক্ষী গোপীনাথ সনে।
ভুবন মোহন, দেউল ভিতরে,
দেখিল একাম্রবনে॥"

গোবিন্দদাসের কড়চায় সাক্ষিগোপালের নাম আছে, মুরারী সাক্ষিগোপালের নাম মাত্রও উল্লেখ করেন না; কবিকর্ণপূর সাক্ষিগোপালের অনেক কথাই বলিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পুরী বিভাগ)

সাক্ষিগোপাল।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের পুরী যাইবার শাখাপথে সাক্ষিগোপাল ষ্টেসান। ষ্টেসান হইতে প্রায় একপোয়া পথ দূরে গুপ্তবৃন্দাবন গ্রামে বৃহৎ উদ্যান মধ্যে সাক্ষিগোপালের মন্দির। সাক্ষিগোপালের অপর নাম সত্যবাদী। সাক্ষি-গোপাল ষ্টেসান হইতে তামাক, নারিকেল প্রভৃতি, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য নারিকেল। এক্ষণে তথায় অনেক ফলপূর্ণ নারিকেল বৃক্ষ; বোধ হয় পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। বর্ত্তমান গোপালমন্দির চৈতন্যদেবের সময় নির্ম্মিত হয় নাই; চৈতন্যদেবের সময় গোপাল-মূর্ত্তি কটক রাজধানীতে বা তন্নিকটে ছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনেক পরে গোপাল-মূর্ত্তি বর্ত্তমান আবাসে নীত হইয়া থাকিবেন। তাহারও পূর্ব্বে মূর্ত্তি গোদাবরীর অপর পারে বিদ্যানগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উৎকল-রাজ পুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগর জয় করিয়া নিজ রাজধানী কটকে ঐ মূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং তথায় সংস্থাপিত করেন।

"এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছেন চিরকাল॥
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সেই দেশ জিতি নিল করিয়া সংগ্রাম* ॥
তার ভক্তিবশে গোপাল আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটক আইল॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

---

* এই সংগ্রামের এবং সাক্ষিগোপালের আনয়নের বিশেষ বিবরণ "কাঞ্চী কাবেরী" নামক উৎকল-গল্পে আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ দাস কবিকর্ণপুর ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন—

"ততশ্চিরেণ গজপতিমহারাজেন পুরুষোত্তমদেবেন আনীয় স্বরাজধান্যাং স্থাপিতঃ।"

কটক পুরুষোত্তমদেবের রাজধানী ছিল। তজ্জন্য প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষিগোপালদেবকে দেখিয়া পুরে ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন।

কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন—

"পুণোবি বনমগ্‌গং লম্ভিঅ সাক্খিগোবালদংসণত্থং
কড়অণামধেঅং রাঅধ্যানীং গও।"

পুনর্ব্বার বনপথে আসিয়া সাক্ষিগোপালকে দর্শন করিতে কটক-রাজধানীতে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সাক্ষিগোপালের মন্দির আধুনিক বটে, কিন্তু নির্ম্মাণপ্রণালী প্রাচীন দাক্ষিণাত্য প্রণালী হইতে বিভিন্ন নহে;—পুরাতন উৎকল প্রণালী। মন্দিরের প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১০৮ হাত, প্রস্থে ৯২ হাত। মন্দিরটী প্রায় ৪৫ হাত উচ্চ ও কারুকার্য্যে আবৃত। কারুকার্য্যে অশ্লীলতার অভাব নাই। মন্দিরের পার্শ্বেই বৃহৎ সরোবর। সরোবরের সোপান প্রস্তরময়। সরোবরের মধ্যে চন্দনোৎসব-মণ্ডপ। মন্দিরের প্রাঙ্গণ লেটারাইট প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। নিকটেই ফলের ও ফুলের বাগান। মন্দিরাভ্যন্তরে বিষ্ণুর সুন্দর দ্বিভুজ ৫ ফুট পরিমিত মুরলীধর বালমূর্ত্তি।

দ্বিভুজ মূর্ত্তি পুরাতন—

"তে ভ্রান্তাঃ কটকাদৌ সাক্ষিগোপালাদয়োঽতিপ্রাচীনা এব।"

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্, ৬ষ্ঠ অঙ্কঃ।

তাহারা ভ্রান্ত। কারণ কটকাদিপ্রদেশে অতি প্রাচীন কালের সাক্ষি-গোপালাদি রহিয়াছে।

মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা উৎকল দেশের ভাস্কর দ্বারা নির্ম্মিত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রথা মূর্ত্তিতে বিশদরূপে পরিদৃশ্যমান।

পার্শ্বে শ্রীমূর্ত্তি ; ইহাতে উৎকল-প্রথা স্পষ্ট প্রতীয়মান। প্রবাদও আছে যে শ্রীমূর্ত্তি উৎকলের প্রথায়। বোধ হয় মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীমূর্ত্তি গোপালের পার্শ্বে ছিলেন না, কেবল মনোহর গোপাল মূর্ত্তিই তিনি দেখিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

"দেখি সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
প্রভু বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম আনন্দ ক্রন্দন॥"—অন্ত্য ২

কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন :—

"কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হইলা আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন॥"

মহাপ্রভু গোপালের স্তব করিলেন। কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

বেণুবাদনপরোপি স বেণুং
স্বাধরাৎ ক্ষণমধো বিনিধায়।
তেন সার্দ্ধমিব বর্দ্ধিত-শুদ্ধ-
শ্রদ্ধমীহিতকথোহয়মলোকি॥

গোপাল মুরলীবাদনে তৎপর থাকিয়াও ক্ষণকাল বংশী অধর হইতে অধোভাগে রাখিয়া অপরিমেয় শ্রদ্ধাসহকারে তাহার সঙ্গে যেন আলাপ করিতে লাগিলেন, ইহা অনেকেই দেখিয়াছিল।

মহাপ্রভু সাক্ষিগোপালে রাত্রিবাস করেন। রাত্রিকালে নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষিগোপালে দাক্ষিণাত্যে আগমনের বিবরণ বলিয়াছিলেন। গোপাল মূর্ত্তি কিরূপে বৃন্দাবন হইতে বিদ্যানগরে আগত ; কিরূপে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম-দেব বিদ্যানগর জয় করিয়া তথা হইতে কটকে আনয়ন করেন, সে সমস্তই চৈতন্য চরিতামৃতে সুন্দররূপে বিবৃত আছে।

কবিকর্ণপুর সংক্ষেপে বলিয়াছেন।—

সাক্ষিত্বেন বৃতো দ্বিজেন স চলংস্তস্তৈব পশ্চাচ্ছনৈঃ
শ্রীমৎকোমলপাদপদ্মযুগলেনারাবদন্নূপুরম্।
দৃষ্টস্তেন নিবৃত্তকন্ধরমহো মাহেন্দ্রদেশাবধি
প্রাপৈ্যব প্রতিমাত্মমম্বরমনাস্তত্রৈব তস্থৌ প্রভুঃ॥

এক ব্রাহ্মণ সাক্ষী দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, ভগবান নিজ চরণ-কমলস্থিত নূপুরের মধুর ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র দেশাবধি আসিয়া অগ্রগামী ব্রাহ্মণকে পশ্চাৎ-ভাগে দেখিতে দেখিয়া তথায় অবস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বে বহু তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভু যখন কটকে আসিয়াছিলেন, তখন লোকমুখে সাক্ষিগোপালের ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলেন।*

---

* নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনি লোকমুখে।
সেই কথা কহেন প্রভু শুনে মহাসুখে॥—
"পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহা করিলা গমন॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিঞা।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশবন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয়॥
কেশিতীর্থে কালিহ্রদাদিতে করি স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাহা করিল বিশ্রাম॥
গোপালসৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই চারি॥

দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রায়।
আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায়॥
ছোট বিপ্র করে সর্ব্বদা তাহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হইল মন॥
বিপ্র কহে তুমি আমায় বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা॥
পুত্রে হো পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলা শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়॥
মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদি বিহীন॥
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণ-সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ্ বাঢ়য়॥
বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিনু নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র কহে তোমার আছে স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥

তোমারে কন্যা দিব সভার করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি কর অঙ্গীকার॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে হয় মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল॥
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষি বোলাব যদি অন্যমত দেখি॥
এত কহি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরু বুদ্ধে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কথোদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রীপুত্র জাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়॥
একদিন নিজ লোক একত্র করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস॥
বিপ্র কহে তীর্থ বাক্য কেমনে করি আন।
যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যা দান॥
জাতি লোক কহে সবে তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥
বিপ্র কহে সাক্ষী বোলাইঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা নিবে মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ যায়॥
পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহো দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥

নাহি কহি না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল তোমার শরণ॥
এই মত চিন্তে বিপ্র চিন্তিতে লাগিলা।
আর দিন লঘু বিপ্র-ঘর আইলা॥
আসিঞা পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার॥
এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল।
তার পুত্র ঠেঙ্গা হাতে মারিতে আইল॥
অরে অধম মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাহে যেন চাঁদ ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইঞা গেল।
আর দিন গ্রামের লোক সভা ত করিল॥
সব লোক বড় বিপ্রে বোলাইঞা লইল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥
এহো মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্ব জন।
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ॥

এত শুনি তার পুত্র বাক্‌ছল পাঞা।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা॥
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হইল মন।
আর কেহো সঙ্গে নাঞি এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিলা পাগল॥
সব ধন লঞা কহে চোর লৈল ধন।
কন্যা দিতে কহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তুমি সব লোক কহ করিয়া বিচার।
মোর পিতার কন্যা যোগ্য ইহাকে দিবার॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধন লোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্ম ভয়॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিতে কহে এই অসত্য বচন॥
এই বিপ্র মোর সেবায় সন্তুষ্ট হইলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥
তবে আমি নিষেধিল শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহো মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥
তভু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিমু তুমি কর অঙ্গীকার॥
তবে মুঞি কহিল শুন দ্বিজ মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির নহিবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিলু দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্ম কন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥

তবে আমি কহিল এই তোমার দৃঢ় মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥
তবে ইহোঁ গোপাল আগে যাইয়া কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥
তবে আমি গোপালের সাক্ষি করিঞা।
কহিল তাহার পদে বিনতি করিঞা ॥
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যা দান।
সাক্ষি বোলাইব তোমা হৈও সাবধান ॥
এই বাতে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥
তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষি দেন আপনি আসি এথা ॥
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে ভাল এই বাত হয় ॥
বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ সহজে দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা সাক্ষী নারিবে আসিতে।
দুই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে ॥
ছোট বিপ্র কহে পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি বলে এ সব বচন ॥
তবে সবলোক এক পত্র ত লিখল।
দোঁহার সম্মতি লঞা আপনে রাখিল ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সভাজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন।
স্বজনমৃত্যু ভয়ে কহে লপটি বচন ॥
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষি বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥

এতশুনি সবলোক উপহাস করে।
কেহো কহে ঈশ্বর দযালু আসিতেহো পারে॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ।
বিপ্রের প্রতিজ্ঞা যায় এই মোর দুখ॥
এত জানি সাক্ষি দেহ তুমি দয়াময়।
জানি সাক্ষি না দেয় যেই তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে যাহ বিপ্র আপন ভবন।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণ॥
আবির্ভূত হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥
বিপ্র কহে হও যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তভু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্ত্যে যাঞা যদি ত্রই শ্রীবদনে।
সাক্ষি দেহ যদি তবে সর্ব্ব লোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী॥
প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য সাধন॥
হাসিঞা গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে॥
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীত করিবে॥

এক সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিলা গমন॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন॥
এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইল।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিল॥
ইবে মুঞি গ্রামে আইলু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিঞা সাক্ষী আগমন॥
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়।
ইহাঁ যদি রহে তবে কিছু নাহি ভয়॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিঞা চাহিল।
হাসিঞা গোপালদেব তাহাঞি রহিল॥
ব্রাহ্মণে কহিল তুমি যাও নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি না যাব অতঃপর॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনি সব লোক চিত্ত চমৎকার হৈল॥
আইসে সকল লোক সাক্ষি দেখিবারে।
গোপাল দেখিঞা হর্ষে দণ্ডবৎ করে॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোক আনন্দিত।
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইলা বিস্মিত॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষি দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥

দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর॥
যদি বর দিবে তবে রহ এইস্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোক জানে॥
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্ব্বজন॥
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বুলি নাম খ্যাতি হৈল॥
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিঞা সংগ্রাম॥
সেই রাজা জিনি লৈল তার সিংহাসন।
মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥
তার ভক্তিরসে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া রাজা কটক আইল।
জগন্নাথে আনি দিল রত্ন সিংহাসন।
কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয়॥
ঠাকুরের নাসিকাতে যদি ছিদ্র হৈত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥

এত চিন্তি নমস্কারি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে॥
বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি আছে আমার নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল নাসায় মুক্তা ছিদ্র দেখিয়া।
মহা মহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা॥
সেই হইতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি॥

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী নামের প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা অজ্ঞাত। চৈতন্যচরিতামৃতের বৃত্তান্তই সাক্ষীগোপালের প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ। অধিকন্তু ভক্তি ও সত্যের জয়ই মহাবিষ্ণুর অভিপ্রেত। সত্যের জয়ের জন্য তিনি নিজেও সাক্ষী দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জানিয়া সাক্ষী না দেওয়াও মহাপাপ—"জানি সাক্ষি না দেয় যেই তার পাপ হয়।" এখন সে ভাব নাই, সাক্ষী দিয়া সত্য কথা বলাও পাপজনক বলিয়া অনেকের সংস্কার। সত্য-সংস্থাপনের জন্য যত্ন সকলের কর্ত্তব্য—দৃষ্টান্ত নিজে মহাবিষ্ণু।

একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বর।

একাম্রকানন হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুকীর্ত্তির বিশেষ দর্শনীয় প্রদেশ। ইহা কটক হইতে পুরী যাইবার রাজপথের নিকটেই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভগবানই

হউন বা ভগবদ্‌ভক্তই হউন, এই গুপ্ত কাশীতীর্থ পর্য্যটন না করিয়া, সর্ব্ব-তীর্থময় বিন্দুসরোবরে স্নান না করিয়া, জগন্নাথদর্শনে যাইতে পারেন নাই। ইহা কটক হইতে দশ ক্রোশ দূরে।

"তবে মহাপ্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি। —বৃন্দাবন দাস-অন্ত্য ২।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভুবনেশ্বরের কথা বৃন্দাবন দাসের উপর বরাত দিয়া গিয়াছেন, নিজে কিছু বলেন নাই :—

ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন। —মধ্য ৫।

জয়ানন্দ মিশ্রও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ভুবনেশ্বরে যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভূগোল বর্ণনায় অনেক দোষ আছে। বোধ হয় তিনি নিজে উৎকলে যান নাই। মুরারি ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দের কড়চায় ভুবনেশ্বরের নাম মাত্রও নাই।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

কটক হইতে পুরুষোত্তম যাইতে রাজপথে আগেই খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। উভয় গিরিই বৌদ্ধ গুম্ফময়, উভয়ই এখনও বৌদ্ধ তীর্থ। উভয় গিরিই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ জীবনের, বৌদ্ধ কীর্ত্তির বিশেষ পরিচয়স্থল। শিল্পকার্য্যে বৈদিক ও বৌদ্ধে প্রভেদ ছিল না; শিল্পীর পার্থক্য ছিল না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গিরিদ্বয়ের উপরে উঠিয়া গুম্ফ ও বুদ্ধমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন কি? তাঁহার আবির্ভাবের অন্ততঃ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে * কেন্দুবিল্বকবি জয়দেব "মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর" প্রথম স্তোত্রেই বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গিয়াছিলেন।

* পরিশিষ্ট দেখ

অজয় নদীর কূলে ও লক্ষণ সেনের রাজসভায় যে দশাবতার-স্তোত্র প্রথম গীত হইয়াছিল, তাহা ভাগীরথীর কূলে নবদ্বীপে অনতিপরেই কত শতবার গীত হইয়া থাকিবে! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত সেই স্তোত্র কতশতবার কীর্ত্তন করিয়া ভক্তি ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ তাঁহার প্রাণ ছিল; তথাপি তাঁহার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উপর না উঠিয়া দেখাই সম্ভব। প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে গিরিদ্বয়ের উল্লেখ নাই। একাম্রপুরাণে খণ্ডাচল একাম্রকাননের পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে—"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ"। মহাপ্রভু পুরুষোত্তম যাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, এমন কি ভুবনেশ্বরেই একদিন মাত্র ছিলেন। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তখন পৌরাণিকদিগের প্রায়ই ত্যজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় আমাদের তীর্থ নহে। উদয়গিরির পাদদেশে এখন একটী পর্ণকুটীর আছে; তাহার নাম "বৈরাগীর মঠ।" মঠাধিকারী দর্শকগণকে অনেক খড়ম দেখাইয়া থাকেন। খড়মগুলি সাজান আছে ও দেওয়ালে চৈতন্য-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। একজোড়া খড়ম চৈতন্য মহাপ্রভুর খড়ম বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে—যেন মহাপ্রভুর ভুবনেশ্বর যাইবার সময় বৈরাগীর মঠে খড়ম রাখিয়া গিয়াছিলেন!

যাহা হউক ইহা নিঃশংসয়ে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবদ্দশায়, "হিন্দু", "হিন্দুধর্ম্ম", "হিন্দুদেবতা" এ সকল কথা প্রচলিত ছিল না। আমরা ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রভেদ করিতে শিখিয়াছি, তৎকালে সেরূপ প্রভেদ ছিল না; বস্তুতঃ বিশেষ প্রভেদও নাই। তৎকালে উভয়ই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সমূহের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত ছিল; উভয়ই "হিন্দুধর্ম্ম" কেবলমাত্র তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের ভারতবর্ষে বিশেষ অবনতি হইয়াছিল!

কেশরী রাজবংশের রাজত্বকালে বৈদিক ও পৌরাণিক পূজা ও ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল, বুদ্ধদেব-পূজা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের হ্রাস হইতে-

ছিল। চীন পরিব্রাজক হিউন্‌থ্‌সং ওড্রদেশ দিয়া দক্ষিণাত্যে গমন করেন। তিনি ওড্রদেশে প্রায় ১০০ বৌদ্ধ আশ্রম দেখেন; তাহাতে প্রায় দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিত। শ্রমণেরা মহায়ানাবলম্বী ছিল। তিনি ব্রাহ্মণধর্ম্মে দীক্ষিতদিগের অনেক দেবালয় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের পরস্পরের বিশেষ বিভিন্নতা দেখেন নাই, বিদ্বেষভাব ছিলই না। বস্তুতঃ উভয় ধর্ম্মের প্রকাশ্য বিভিন্নতা খুবই কম ছিল। উভয়ই হিন্দুধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণেরই অধিকাংশ বিষয়েই একতা ছিল। বৌদ্ধগণ অহিন্দু ছিল না। তৎকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ তেত্রিশ কোটী দেবদেবী মানিত, দেব-দেবীগণের পূজা করিত, ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করিত এবং গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি অনাচার করিত না। এখন যেমন বৈষ্ণব ও শাক্তে প্রভেদ, তৎকালে বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে তদধিক প্রভেদ ছিল না। জৈন ধর্ম্ম অবৈদিক কিন্তু জৈনদিগের সহিত হিন্দুদিগের কাটাকাটি মারামারি ছিলনা ও নাই। বৈষ্ণব, হিন্দু ও জৈনে এখনও বিবাহাদি হইয়া থাকে; পূর্ব্বেও হইত। জৈন বৈষ্ণব হওয়ার দৃষ্টান্ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জগৎশেঠ হরেক চাঁদ; অথচ তাহাদের পরিবারদিগের জৈনবংশে বিবাহাদি হইতেছে। আরা সহরে অনেক জৈন আছে, যাহাদেরও বৈষ্ণবদিগের সহিত বিবাহাদি হয়। পাশ্চাত্য প্রদেশে মুসলমানেরা যেরূপে স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, যেরূপে তাহারা বিধর্ম্মীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের বধ ও নিষ্কাসন করিয়াছিল; ইউরোপে রোমেন্‌ কেথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট-দিগের পরস্পর যেরূপ বিদ্বেষ, যেরূপ পরস্পরের নির্য্যাতন ছিল, ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণেতর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সেরূপ ভাবের, সেরূপ ব্যব-হারের বিশেষ প্রমাণ লক্ষিত হয় না। অষ্টম ও নবম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাও তান্ত্রিক অনাচারী বৌদ্ধ শ্রমণদিগের উপর, গৃহীদের উপর নহে। শান্তিময় ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের যুক্তি ও কৌশলই ধর্ম্ম প্রচারের অস্ত্র ছিল। বন্দুক বা শাণিত

লৌহ দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার ধঃবিরুদ্ধ ছিল। কোন কোন রাজা কখন কখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কুমারিল ভট্টের সময়ে জোর জবরদস্তী, অবৈধ কার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। পাশ্চাত্য ধর্ম্ম প্রচারের অন্যায় রীতি ভারতবর্ষে অবশ্যই প্রচলিত ছিল এই বিবেচনায় অনেকেই লিখিয়াছেন, অনেকেই মনে করেন. বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরস্পরের বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত মহায়ান-বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মে এরূপ প্রভেদ ছিল না যে উভয় ধর্ম্মে বিশেষ বিদ্বেষ ভাবের সম্ভাবনা ছিল; বুদ্ধদেবের প্রাধান্য সম্বন্ধেই মতের পার্থক্য ছিল মাত্র। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাংশ শঙ্করাচার্য্য রাজাশ্রয়ে বা সৈন্যসামান্তাশ্রয়ে স্বধর্ম্ম প্রচার করেন নাই; তাঁহার দার্শনিক মত, তাঁহার অদ্বৈতবাদ, তাঁহার শৈবত্ব, তাঁহার নিজের প্রতিভার বলে ভারতবর্ষে গৃহীত হইয়াছিল; তজ্জন্য শাক্য গৌতমের প্রচলিত মত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়াছিল।

ষষ্ঠ খৃষ্ট শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ন উড়িষ্যায় উভয় ধর্ম্মের অভেদে প্রচলন দেখিয়া যান। বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় আর তিন চারি শত বৎসরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে লুপ্ত প্রায় হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে কোনকালেই বিশেষ প্রভেদ ছিল না, বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনের পর অনেক বৌদ্ধ মন্দিরই হিন্দু মন্দির হইয়াছিল।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি ভুবনেশ্বরের ২॥০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে। উভয়ই লেটারাইট ও বালুকাপ্রস্তরময়। উভয়ের মধ্যস্থ নিম্নভূমি কটক যাইবার রাজপথ। উদয়গিরিতে প্রস্তর হইতে খোদিত ক একটি একতল গুম্ফ আছে। এই সকল গুম্ফ খৃষ্টজন্মের ২—৩ শতাব্দীতে খোদিত। ইহারা জৈন ও বৌদ্ধ। গণেশ গুম্ফে গণেশ মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু মূর্ত্তি সকলই আধুনিক একথা বলা যায় না। জৈন বা বৌদ্ধরাই গণেশ-মূর্ত্তি খোদিত করিয়া থাকিবে গণপতি তাহাদের একটী দেবতা ছিলেন।

খণ্ডগিরি উদয়গিরি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে বৃহদাকার। ইহার উপরিভাগে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। উঠিবার পথ প্রস্তরময় সোপান। সোপানের উপরেই চারিটী গুম্ফ। একটা ভগ্ন প্রায়, তৎপার্শ্বের একটিতে হিন্দু দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও তথায় এখনও সময়ে সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পঠিত হয়। তৎপার্শ্বের গুম্ফায় অনেক ভাস্করকার্য্য পরিদৃশ্যমান। তথায় দশভূজা ও সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তিও রহিয়াছে। পৌরাণিকেরাই যে এই সকল দেবমূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। মহায়ান বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবদেবী সমূহের পূজায় বিমুখ ছিলেন না। মহায়ান বৌদ্ধগণই ঐ সকল মূর্ত্তিরই কারণ হইতে পারেন। দশভূজা-গুম্ফের পরেই একটি গুম্ফায় বুদ্ধদেবের অনেকগুলি পদ্মপাণি-মূর্ত্তি খোদিত আছে। নিম্নেই কয়েকটী মাতৃকামূর্ত্তি, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ একত্রিত। এখানে মহায়ান বৌদ্ধমতের অনেক লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিটি গুম্ফার একটু অন্তরেই একটি সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন একটিমাত্র সিংহ-মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে যে ঐ সিংহদ্বার কেশরীরাজ-ললাটেন্দু-নির্ম্মিত। লোকে বলিয়া থাকে যে রাত্রিকালে সিংহদ্বারে তোপধ্বনি হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে "রাধাকুণ্ড"। ইহা একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। জল অতি পরিষ্কার, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যও দেখা যায়। পাহাড়ের শীর্ষদেশে দুইটি বৌদ্ধমন্দির। দুইটীই কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। অভ্যন্তরে বৌদ্ধদেবের বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এক্ষণে ঐ দুইটি মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। কিয়দন্তরে "শ্যামকুণ্ড"; গিরিগুহায় জলাশয়। উহা প্রস্তরাবৃত, জল অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ, জলাশয়ে অনেক ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। ইহার নিকটেই "আকাশগঙ্গা" নামক কুণ্ড। সম্ভবতঃ পৌরাণিকেরা অধুনা এই সকল নামকরণ করিয়াছেন। বৌদ্ধ মন্দিরদ্বয়ের নিকটে বৌদ্ধস্তূপসমূহ রহিয়াছে। মহায়ান বৌদ্ধগণ পুণ্যার্থ এই সকল স্তূপ সংস্থাপন করিয়া থাকিতেন। এখন উদয়গিরি বা খণ্ডগিরিতে

বা নিকটস্থ সমতলভূমিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুক বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী গৃহী কেহই নাই। পৌরাণিক হিন্দুরাজ্যে বৌদ্ধস্তূপ সমূহ "দেবসভা" নাম ধারণ করিয়াছে। খণ্ডগিরির শিখর হইতে অভ্রভেদী ভুবনেশ্বরের মন্দির বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বরের মন্দির গিরিদ্বয়ের পাদদেশ হইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরে; পথ মাঠের উপর দিয়া। পথের দুই পার্শ্বে লেটারাইটময় ভূমি। কোন কোন অংশ বন-শূন্য—বৃক্ষ-শূন্য। কোন কোন স্থলে দুই পার্শ্বে কুঁচলা গাছের বন; মধ্যে মধ্যে সোঁদাল ও আমলকীর বন আছে; মধ্যে মধ্যে বেত ও বাঁশের ঝোপ। এক্ষণে পথের ধারে একটী গ্রাম আছে, আবাদী ভূমিও আছে।

ভুবনেশ্বর।

দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াই মহাপ্রভু গিরিজা-সমন্বিত গিরীশ-দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন।

দদর্শ তত্রাখিলশোভয়োজ্জ্বলং
চলৎপতাকং শিবমন্দিরং মহৎ।
সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং
সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্॥
নিপত্য ভূমৌ প্রণনাম দেবঃ
শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ম্।
পতাকয়া নাকনদীবিভাঙ্গং
দধৎ সমারোহতি হেলয়েব॥

—মুরারি।

অনন্তর মহাপ্রভু তথায় ধবলগিরি সদৃশ সুবৃহৎ শুভ্রবর্ণ নিখিল শোভায় সমুজ্জল চঞ্চল-পতাকা-রঞ্জিত সমুন্নত-শিখরদেশ-শোভিত সুরম্য-বহির্দ্বার-বিশিষ্ট মন্দির দর্শন করিলেন। সেই শিবমন্দির বিচিত্র-ত্রিশূল-শোভিত-

শিখরদেশে শুভ্রপতাকাচ্ছলে হেলায় মন্দাকিনী-কান্তি ধারণ করিয়াছে, মহাপ্রভু তাহা দর্শন মাত্র ভূমি বিলুণ্ঠিত দেহে প্রণাম করিলেন।

বৃন্দাবনদাস স্কন্দপুরাণ মতে ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"কাশী মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে॥
তবে গৌরী সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নররাজগণে কাশী করয়ে বিলাস॥
তবে কাশীরাজ নামে হৈল এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি শিবপূজা॥
দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্রতপে শিবপূজে কৃষ্ণে জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে।
বর মাগ বলিলে সে রাজা বর মাগে॥
এক বর মাগি প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারি রণে॥
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥
তবে বলিলেন রাজা চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্বগণ সহ আছি আমি॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপাত অস্ত্র লইয়া মুঞি তোর পাছে॥
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা হরিবে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্বগণে।
তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করিবার মনে॥

সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী দেবকী নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেই ক্ষণ ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন।
এড়িলেন মহাপ্রভু সবার দমন ॥
কার অব্যাহতি নাই সুদর্শন স্থানে।
কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥
বারাণসী দাহ দেখে কৃষ্ণ মহেশ্বর।
পাশুপাত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥
পাশুপাত অস্ত্র কি করিবে চক্র স্থানে।
চক্রতেজ দেখি পলাইল সেই ক্ষণে ॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥
চক্রতেজ ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিগ না পায়েন ত্রিলোচন ॥
পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাশা পীড়িত।
শিবের হইল এবে সেই সব রীত ॥
শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেলা গোবিন্দ শরণ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু দেবকী নন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সবার রক্ষিতা ॥
জয় জয় আদোষদরশি কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু ॥
জয় সর্ব্ব অপরাধ-ভঞ্জন-চরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ ॥

শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীব নাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধহাস্য মুখে বলেন বচন॥
কেন শিব তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার এমত কেন বুদ্ধি॥
কোন কীট কাশীরাজা অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারে ও না সহে যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা অস্ত্র আর কত॥
সুদর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চায় করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি সংসার ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্ম নিবেদন॥
তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে।
কেহ কেবা আছয়ে যে তোর মায়া তরে॥
বিশেষ দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥

তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র-মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কুবুদ্ধি যেন মোর কভু নয়।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয়॥
সেই অপরাধ কৈনু করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর বা বলিব কা'র পায়॥
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিল প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান।
সকল গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান॥
একাম্রকানন বন স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর॥
সেহো বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থান আমার পরম গোপ্যপুরী।
সেই স্থানে শিব আজি কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম আর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধু তীরে বট মূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু না করিতে পারে॥

সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
ভুবন-মঙ্গল করি কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
স্মরণে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সেই মোর সম॥
সে স্থানে নাহিক যম দণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমায় দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি মুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত হইবা শ্রীভুবনেশ্বর॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত—২য় অধ্যায়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহর্ষি নারদের নিকট ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে ঐ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রের নাম চক্রক্ষেত্র। যাজপুরের নাম গদাক্ষেত্র বা বিরজাক্ষেত্র।

স্কন্দ-পুরাণেও কোটি লিঙ্গের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বাহ্ন-পূজাসময়ে কোটিলিঙ্গেশ্বরস্য বৈ
চর্ব্বরীশঙ্খকাহালমৃদঙ্গমুরজধ্বনিম্
বাদ্যপূর্ব্বাণ্ডম্ মহানন্দাং দূরাৎ শুশ্রাব ভূপতিঃ।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দূর হইতে কোটিলিঙ্গেশ্বরের পূর্ব্বাহ্ন পূজাসময়ে সেই মহারণ্য হইতে সমুত্থিত চর্ব্বরী, শঙ্খ, কাহাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত ও "ঈশ্বর-লিঙ্গ-কোটি", "মনোজ্ঞ-গন্ধার্চ্চিত বরতোরণাঢ্য প্রাসাদ কোটী" ও "মণিকর্ণিকাদি তীর্থ কোটি" সমন্বিত একাম্রকাননের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু উহা কবির বর্ণনা। জয়ানন্দও কোটি স্থলে উন-কোটি লিখিয়াছেন; ইহাও কবির বর্ণনা। প্রকৃত প্রস্তাবে একাম্রকানন এককালে শিবমন্দিরে আবৃত ছিল। প্রবাদ আছে যে কেশরীরাজগণ তথায় এক লক্ষ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু তাঁহাদের সে সদভিলাষ সম্পূর্ণ হয় নাই। এখনও যেখানে সেখানে শিবমন্দির।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় অপূর্ব্ব দেবমন্দির অতি বিরল। কেশরী রাজবংশ একাম্রকাননে রাজধানী সংস্থাপন করেন; তাঁহারা শৈব ছিলেন এবং এরূপ বারাণসী সদৃশ পবিত্র ভূমিই শৈব-রাজদিগের ধর্ম্মরাজধানীর উপযুক্ত স্থান। একাম্রকাননকে প্রকৃত শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তাহারা কোটি বা উন-কোটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বসন্তি যত্রেশ্বরলিঙ্গকোটো।
বিশ্বেশ্বরাদ্যাশ্চ সুপুণ্যতীর্থাঃ।

'যেস্থানে বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ কোটি লিঙ্গ বাস করিতেন এবং যেস্থান বহু পুণ্যতীর্থের সমাবেশ ভূমি।'

যযাতি-কেশরী একাম্রকাননে রাজধানী স্থাপন করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। এরূপ বিশাল, উন্নত ও কারুকার্য্য-খচিত মন্দির অল্পদিনে নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা সূর্য্যকেশরী ও অনন্ত-কেশরীর সময়েও নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে থাকে। অবশেষে যযাতি-কেশরীর প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী ৬৬৭ খৃঃ অব্দে মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করিতে সমর্থ হন।

গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোৎ রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী।

রাজা ললাটেন্দু কেশরী পঞ্চশতাষ্টাশীতি (৫৮৮) শকাব্দে কৃত্তিবাসের এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ললাটেন্দু-কেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উৎকলে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নির্ম্মাণের পর হইতেই একাম্রকাননের সাধারণ নাম ভুবনেশ্বর হইয়াছিল। অনতিপরেই উৎকলের রাজধানী অন্যত্র নীত হইয়াছিল। একাম্রকানন পুণ্যক্ষেত্র হইলেও, ইহা সসৈনিক রাজধানীর উপযুক্ত নহে। নিকটে প্রশস্ত নদী নাই। তথায় শত্রু আগমন নিবারণের নৈসর্গিক উপায় কিছুই নাই। যাজপুরে, বিশেষতঃ কটকে, সে উপায় আছে। সুতরাং কয়েকশত বৎসর পরেই কটকেই রাজধানী নীত হইয়াছিল।

কেশরী-রাজদিগের পরবর্ত্তী রাজবংশ চোরগঙ্গবংশ বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন: সুতরাং ভুবনেশ্বরের প্রতি উৎকলরাজদিগের ক্রমশঃ লক্ষ্য কমিয়া ছিল। অবনতির পর অবনতি। ১৪৩৬ শকে (১৫১৫ খৃঃ অব্দে) চৈতন্যদেব যে ভুবনেশ্বর দেখিয়াছিলেন এখন তাহারও কিছুই নাই। তখনও উৎকলে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন; তখন অমিততেজ প্রতাপ-রুদ্র পৌরাণিক ধর্ম্মের, পৌরাণিক দেবগণের ও হিন্দু কীর্ত্তির রক্ষক ছিলেন। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বিধর্ম্মীগণের রাজত্ব কালে ভুবনেশ্বরের কতই না পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কতই না কালস্রোতে নিমগ্ন হইয়াছে! তাহাতে আবার কালা-পাহাড়ের ভীষণ অত্যাচার! এখনকার একাম্রকানন দেখিলে যুগপৎ শোক, ক্রোধ ও আত্মগরিমার উদয় হয়। কালের অবিশ্রান্ত কুঠারাঘাত—মুসলমান-দিগের নির্ম্মমতরবারির আঘাত দেখিয়া, কাহার না শোক ও ক্রোধের যুগপৎ আবির্ভাব হইবে? পঞ্চদশ শত বৎসরের পূর্ব্বের অতুলনীয় হিন্দুকীর্ত্তি দেখিয়াই বা কোন্ হিন্দুর আত্মগরিমার উদয় না হইবে? মুসলমানদিগের নিকট বৈদিক বা পৌরাণিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভেদ ছিল না। তাঁহাদের

নিকট উভয়ই হিন্দুধর্ম্ম, উভয়ই পৌত্তলিক ছিল। তাঁহারা মূর্ত্তিমাত্রেই অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন। দেবমূর্ত্তির নাসিকার উপরই যেন তাঁহাদের বিশেষ আক্রোশ ছিল; বৌদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকলেরই নাসিকাচ্ছেদ। অপ্‌তেজোমরুতের অপরিহার্য্য ঘাতে অনেক মূর্ত্তির নাসিকার রূপান্তর হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই অস্ত্রাঘাতের লক্ষণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

পঞ্চদশশকশতাব্দে রুদ্রতেজ প্রতাপরুদ্রের প্রভাবে আফ্‌গান বা পাঠান দেবমূর্ত্তি বা দেবমন্দিরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারেন নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একাম্রকাননে দেবপ্রাসাদকোটি অক্ষুণ্ণ দেখিয়াছিলেন।

প্রাসাদকোট্যো বহুতোরণাঢ্যা
রাজন্তি রাজচ্চল চেল চূড়াঃ
আমুক্তভূষা মনুজা মনোজ্ঞা—
গন্ধার্চ্চিতা ইন্দ্রপদাপিতেহাঃ।—মবারি

তথায় সুরম্য প্রাসাদরাজির সমুন্নত শিখরদেশ চঞ্চল পতাকায় সুশোভিত ভিত, যাহার বহির্দ্বার সকল সর্ব্বত্রাসুলভ ভূষায় বিভূষিত; তথাকার মানবগণ কৃত্রিম ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর অনুলেপনাদি দ্বারা বিভূষিত হয়; অধিক কি সেই প্রাসাদসমূহ এবং অত্রত্য অধিবাসিগণকে দর্শন করিলে স্বতই মনে হয় যেন ইহারা ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে।

এখন সে প্রাসাদগুলি নাই, সে সকল তোরণ নাই। সে সকল সুন্দর দেবমন্দির, দেবপ্রসাদ অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে তাহাও ভগ্নপ্রায়। এখন ভগ্নাবশেষ রক্ষার উপায় হইতেছে বটে; কোন কোনটির জীর্ণসংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সে অকিঞ্চিৎকর। যাজপুরে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি সমূহের যে দশা ভুবনেশ্বরেও তাহাই। কেশরী রাজাদিগের প্রাসাদের চিহ্ন মাত্র আছে। ইহা রেলওয়ে ষ্টেশন যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে।

বিন্দুসরোবর।

চৈতন্য মহাপ্রভু রীত্যনুসারে পুণ্যতীর্থ বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভুবনে-

শ্বরের দর্শন ও পূজা করেন। মহাতীর্থ সকলের বিন্দু বিন্দু সার সংগ্রহ করিয়া বিন্দুসাগর নির্ম্মিত হইয়াছিল,—

বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতস্তং পিনাকিনা। (পাদ্মে)

ভগবান্ পিণাকী তীর্থসকল হইতে বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

"মুরারি মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি" বলিতেছেন :—

বিন্দূন্ সমাহৃত্য সমস্ততীর্থাৎ
কৃতং মহাবিন্দুসরবরাখ্যম্।
দণ্ডং কৃতং দেববরেণ যত্র
স্নানাল্লভেচ্চৈব পদং বিশুদ্ধম্।

সমস্ত তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু সলিল সমাহরণ করিয়া মহাবিন্দু সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে ; ইহাতে স্নান করিয়া জীব পরম পূত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য ॥
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিল অতি ধন্য ॥

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :—

স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে যতেক তীর্থ আছে।
বিন্দু বিন্দু জল থুইল সরোবরের মাঝে ॥
তেঁঞি বিন্দু সরোবর পুরাণেতে কহে।
বিন্দুসরে স্নানমাত্র পুনর্জন্ম নহে ॥
তীর্থচূড়ামণি ইহার অনেক মহিমা।
ইহা পরশিলে যম না লঙ্ঘএ সীমা ॥

এই পবিত্র-সরোবর দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাতের উপর ও প্রস্থে প্রায় ৫২০ হাত বোধ হয় মহাপ্রভুর সময়েও ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় সোপান ছিল। এক্ষণে

সোপানের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণিকা; এই ঘাটেই স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করিতে হয়। মণিকর্ণিকা ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ তীর্থ। সরোবরের মধ্যে উৎকল প্রথানুসারে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে ও তাহার উপর কয়েকটী দেবমন্দির আছে। চন্দনপর্ব্বোপলক্ষে ভুবনেশ্বরের চলদ্-মূর্ত্তির তথায় যাত্রা হয়। মন্দিরগুলির সম্মুখে একটী সোপান আছে; কিন্তু মন্দিরগুলির উপযুক্ত সংস্কার নাই। সরোবরের চতুর্দ্দিকের প্রস্তরময় সোপানের যেরূপ অবস্থা, মন্দিরসমূহের অবস্থা প্রায়ই সেইরূপ। মন্দিরগুলির সম্পূর্ণ জীর্ণোদ্ধার নিতান্ত আবশ্যক। সরোবরের গর্ভে ও পার্শ্বে অনেকগুলি প্রস্রবণ ছিল। এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই জল প্রবাহিত হইত; এখন জলের বর্ণ সবুজ। জলের বর্ণ যেরূপই হউক, বিন্দুসরোবর আমাদের পুণ্যতীর্থ। শিবপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও একাম্রপুরাণে ইহার বিশেষ পুণ্যময়ত্ব দর্শিত আছে।

স্নাত্বা বিন্দু সেবস্তীর্থে দৃষ্টা তং কীর্ত্তিবাসসং।
সর্ব্বপাপক্ষয়াদন্তে জ্যোতির্লোকমবাপ্নুয়াৎ। পাদ্মে

মানবগণ সেই বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া কৃত্তিবাস মহাদেবকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়।

অনন্তবাসুদেব।

বিন্দুসরোবরের অগ্নিকোণ শঙ্করবাপী নামে খ্যাত। বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-দিকে অনন্তবাসুদেবের মন্দির। প্রধান মন্দিরের গঠন ও শিল্পকার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কতশত বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু ভাস্কর যেন অল্প দিন হইল কার্য্য শেষ করিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বাসুদেব-বলরামের জগন্নাথেরও প্রস্তরময় মূর্ত্তি; সুভদ্রাদেবী উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরাজমানা। মন্দির উৎকল প্রথায় নির্ম্মিত। প্রধান মন্দিরের বাহিরে লক্ষ্মীর মন্দির, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি এখন বাসুদেবের নিকটেই। নাট্য মন্দিরে স্তম্ভোপরি গরুড়-মূর্ত্তি। অনন্তবাসুদেবের মন্দির বহুকাল বিদ্যমান্ আছে। বিন্দুসরোবরে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া প্রথমেই অনন্তবাসুদেব দর্শনীয়। বিন্দুসরোবরের

পূর্ব্ব কিনারায়ও কয়েকটী মন্দির ও দেবমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে হনুমানজী ও ব্রহ্মার মূর্ত্তিই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

মহাপ্রভু বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরদেবের পূজা করিবার নিমিত্ত গমন করেন। বুধ-গয়ার মহাবোধি মন্দির, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির ও ভুবনেশ্বরের মন্দির,তিনই আর্য্যাবর্ত্তে প্রসিদ্ধ; তিনই আশ্চর্য্য আর্য্যকীর্ত্তি। তিনই ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির শিল্প নৈপুণ্যের অসাধারণ পরিচয়স্থান, তিনই অমানুষী বলিলে অত্যুক্তি হয়না,— যেন সত্যই বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্ট।

বুধগয়ার মহাবোধি মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় অভ্রভেদী ও প্রশস্ত নহে; তাহার ভাস্করকার্য্য ও তদ্রূপ সুন্দর নহে। পুরীর মন্দির উচ্চতায় ও পরিমাণে ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা বড়, কিন্তু তাহাতে এত সুন্দর ভাস্কর-কার্য্য নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দির ১২০ হাত উচ্চ; নাট্যমন্দির, জগমোহন ও ভোগমন্দির সকলই প্রশস্ত। মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রায় ৩৩৩ হাত দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে উহা ২৬৬ হাত। চারিদিকের লেটারাইটময় প্রাচীর ৫ হাত উচ্চ। পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বার। ভোগমণ্ডপ রাজা কমলকেশরী নির্ম্মাণ করান ও প্রশস্ত নাট্যমন্দির প্রায় ২০০ শত বর্ষ পরে রাজা শালিনীকেশরী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে অনাদিলিঙ্গ দেবাদিদেব। লিঙ্গের পরিধি প্রায় ১২ হাত। এই অনাদিলিঙ্গরাজের নাম ত্রিভুবনেশ্বর ছিল; ক্রমে "ত্রি" লোপ হইয়া ভুবনেশ্বর হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ও দেবাদিদেবের পূজা করিলেন:—

স কৃত্তিবাসং শিরসা বন্দ
নিবাস দেহং ভুবি দণ্ডবৎ স্বয়ং।
গিরা গিরীশং চ সগদ্গদেন
তুষ্টাব সংহৃষ্টতনুঃ থাঙ্গী।—মুরারি।

দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া তিনি কৃত্তিবাস মহাদেবকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে গদ্‌গদ ভাষায় স্তব করিয়াছিলেন।*

মুরারির শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে যে শিবাষ্টক নিবেশিত হইয়াছে তাহা তিনি নিজেই অদ্ভূত হরিপ্রেম লাভের উপায় বলিয়া গিয়াছেন। সেই শিবাষ্টক কি মহাপ্রভুর মুখবিনির্গত? মুরারি তাঁহার প্রিয় সহাধ্যায়ী ও প্রিয় শিষ্য; তিনি তাঁহার আদি লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন; লীলার সকলই জানিতেন, স্বচক্ষে না দেখুন। মুরারি মহাপ্রভুর কথা না হউক তাঁহার মনোগত ভাব যথাযথ প্রকাশ করিয়াছেন :—

নমো নমস্তে ত্রিদশেশ্বরায
ভূতাদিনাথায় মৃড়ায় নিত্যম্।
গঙ্গাতরঙ্গোত্থিত বাল-চন্দ্র-
চূড়ায় গৌরী নয়নোৎসবায় ॥১

সুতপ্তচামীকরচন্দ্রনীল
পদ্মপ্রবালাম্বুদকান্তিবস্ত্রৈঃ।
সুনৃত্যরঙ্গেষ্ট বরপ্রদায
কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায় ॥২

সুধাংশুসূর্য্যাগ্নিবিলোচনেন
তমোভিদে তে জগতঃ শিবায়।
সহস্রশুভ্রাংশুসহস্ররশ্মি
সহস্রসংজিত্বরতেজসেহস্তু ॥৩

নাগেশরত্নোজ্জ্বলবিগ্রহায়
শার্দ্দূলচর্ম্মাংশুক দিব্যতেজসে।
সহস্রপত্রোপরিসংস্থিতায়
বরাঙ্গদামুক্তভুজদ্বযায ॥৪

সুনূপুরারঞ্জিত পাদপদ্ম
ক্ষরৎ সুধা-ভৃত্য সুখপ্রদায়।

* এই শ্লোকের ৩য় ৪র্থ পঙক্তি অশুদ্ধ।

বিচিত্ররত্নৌষধিভূষিতায়
প্রেমানমেবাদ্য হরৌ বিধেহি ॥৫

শ্রীরাম গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে—
শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব।

ইত্যাদি নামামৃতপানমত্ত
ভৃঙ্গাধিপায়াখিল-দুঃখহন্ত্রে ॥৬

শ্রীনারদাদ্যৈঃ সততং সুগোপ্য
জিজ্ঞাসিতায়াশুবরপ্রদায়।

তেভ্যোহরেভক্তি সুখপ্রদায়
শিবায় সর্ব্বগুরবে নমোনমঃ ॥৭

শ্রীগৌরীনেত্রোৎসবমঙ্গলায
তৎ প্রাণনাথায় বসপ্রদায।

সদাসমুৎকণ্ঠগোবিন্দলীলা—
গানপ্রবীণায় নমোহস্তু তুভ্যম্ ॥৮

১। হে গৌরীনয়নানন্দ, তোমার ভালদেশে শিশুশশী ভাগীরথীবীচি সংক্ষোভে সুন্দর শোভা পাইতেছে; তুমি প্রমথাধিপতি সুরেশ্বর, তোমাকে নমস্কার।

২। তুমি চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি মনিরাজি প্রতিবিম্বিত সমুজ্জ্বল তপ্তকাঞ্চন প্রভায় সুশোভিত হইয়া তাণ্ডবকালে ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ কর, হে কৈবল্যনিদান বৃষধ্বজ তোমাকে নমস্কার।

৩। তুমি চন্দ্র সূর্য্য এবং বহ্নিরূপ ত্রিনয়নের দৃষ্টিদ্বারা সংসারের অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন কর, সহস্র চন্দ্রসূর্য্যতেজ অপেক্ষা তুমি সমুজ্জ্বল, তোমাকে নমস্কার।

৪। তোমার দেহ বহুবিধ রত্ন ও ফণি সকল দ্বারা রঞ্জিত, শার্দ্দূল চর্ম্ম তোমার বসন, তুমি কমলাসনে উপবিষ্ট, অঙ্গদ প্রভৃতিতে তোমার ভুজদ্বয় বিভূষিত, তোমাকে নমস্কার।

৫। তোমার নূপুরশোভিত পাদপদ্ম হইতে যে সুধাক্ষরিত হয়, তৎপানে ভৃত্যগণ পরমানন্দ লাভ করে : তুমি বহুবিধ বিচিত্র ভূষণে ভূষিত, তোমাকে নমস্কার ; তুমি চৈতন্যকে ভগবৎপ্রেম বিতরণ কর।

৬। যাহাদিগের মনোভৃঙ্গ "মুকুন্দ" "শ্রীকৃষ্ণ" প্রমুখ ভগবানের নামামৃত পানে মত্ত, তুমি তাহাদিগের অধিপতি ; তুমি সংসারের সর্ব্ববিধ দুঃখের বিনাশকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার।

৭। তুমি ভক্ত নারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সকল রহস্যের উদ্ভেদকারী এবং তাঁহাদিগের অভীষ্ট বর প্রদান কর্ত্তা, তুমি বিষ্ণুভক্তি সমুদ্ভূত সুখসমূহের প্রসবিতা, জগদ্‌গুরু, তোমাকে নমস্কার।

৮। হে গৌরীপ্রাণনাথ গৌরীনয়নানন্দ, তুমি নিরন্তর ভগবন্নারায়ণ-লীলা-সংগীতশ্রবণ প্রমত্ত, তোমাকে নমস্কার।*

ভুবনেশ্বর মন্দিরের বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বর্ণনাতীত। মন্দিরের বাহিরের দিকের ভাস্করকার্য্যের গুণপণা দেখিলেই বিস্মিত হইতে হয় এবং তাহাতেই তাৎকালিক ভারতবাসিদিগের সামাজিক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। বহির্ভাগের উত্তর দেওয়ালে ভগবতীর, পশ্চিম দেওয়ালে কার্ত্তিকেয়ের ও দক্ষিণে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত। যুদ্ধ বিগ্রহ ও সমাজিক বিষয়ক চিত্রও অনেক খোদিত। যে সময়ে ইউরোপ তমসাবৃত ছিল, যে সময় বর্ত্তমান সুসভ্য জাতি-গণের ইতিহাসে কেবল বর্ব্বরতার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়েই ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব-প্রকোষ্ঠে কেশরীরাজগণ ধর্ম্মপ্রাণতার পরা-কাষ্ঠার চিহ্নস্বরূপ, সভ্যতা ও শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ-স্বরূপ, ভুবনেশ্বরের ও একাম্রকাননের অপরাপর লিঙ্গরূপী মহাদেবের মন্দির প্রস্তুত করাইতেছিলেন। অযত্নে,অমনোযোগে,কালের গতিতে, বিশেষতঃ বর্ব্বরজাতির কুঠারাঘাতে, সেই অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের অনেক নষ্ট হইয়াছে। অনেক দেবমূর্ত্তিরই নাসিকা-

* শেষোক্ত শ্লোকের প্রথম পঙক্তিতে ছন্দঃ পতিত।

চ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু যাহা আছে, তাহাই এথেন্সের নিশ্চয়ই সমকক্ষ। এখনও রক্ষা করিতে পারিলে, আর্য্যদিগের, আর্য্য ধর্ম্মের ও আর্য্য সভ্যতার লিঙ্গরাজের এরূপ অনাদি লিঙ্গ আয়তন অতি বিরল। পাণ্ডারা তাহাতেই হরিহরের ও গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতীর চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। কীর্ত্তি অক্ষয় রহিবে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণ লেটারাইট প্রস্তরময় ও সুদৃশ্য। পার্শ্বে অনেকগুলি দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে গণপতি, স্তম্ভোপরি অরুণদেব, লক্ষ্মী-নৃসিংহ, নীলপ্রস্তরময়ী দ্বিভুজা সাবিত্রী দেবী, ষষ্ঠীদেবী ও মহিষাসন চতুর্হস্ত যমরাজ বিশেষ দ্রষ্টব্য। মূল মন্দিরের বায়ুকোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির রাজা বিজয়-কেশরীর সময়ে নির্ম্মিত অর্থাৎ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের ইহা অঙ্গীভূত, কিন্তু শিল্পকৌশলে ইহা আরও উচ্চশ্রেণীর। মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ হাত, প্রস্থে প্রায় ৩২ হাত ও উচ্চে প্রায় ৩৬ হাত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই মন্দির অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার চরিত-লেখকেরা শক্তিমন্দিরের প্রায়ই উল্লেখ করেন নাই। যাজপুরের বিরজামন্দিরের উল্লেখ আছে, কিন্তু যাজপুর বিরজাক্ষেত্র।

প্রবেশদ্বার সুরম্য। সম্মুখে নবগ্রহের মূর্ত্তি। মন্দিরের পৃষ্ঠদেশস্থ প্রাঙ্গণের অপর দিকে বোধ হয় অন্যান্য মন্দির ছিল, কিন্তু তাহা এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়াছে। তাহা জঙ্গলে আবৃত। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের সাহায্যে সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে কিন্তু কতদিনে সে চেষ্টা সফল হইবে বলিতে পারা যায় না।

গোপালীনির মন্দির।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বেই "গোপালিনীর" মন্দির। "গোপালিনী" পার্ব্বতী। তিনি একাম্রকাননে গোপীবেশধারিণী হইয়াছিলেন। শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে গিরিনন্দিনী মহাদেবের আদেশ লইয়া একাম্র-

কাননে আগমন করেন। তথায় আসিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে অদৃষ্টপূর্ব্ব লিঙ্গরূপে দেখিতে পাইয়া তাঁহার যথাবিধি পূজা করেন।

কদাচিৎ স যযৌ পুষ্পমাহর্ত্তুং কাননান্তরং
ভ্রমদ্ ভ্রমরসংযুক্তং পুংস্কোকিলনিনাদিতম ॥১
তস্মিন্ বনান্তরে তুঙ্গে হ্রদমধ্যাদ্বিনির্গতাঃ।
সহস্র সংখ্যকা গাবো দদর্শ সুপয়োধরাঃ ॥২
তা আগত্যমুনে সর্ব্বা গাবঃ কুন্দেন্দু সুপ্রভাঃ।
তত্রৈকস্মিন লিঙ্গবরে তত্যজুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ ॥৩
প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তস্য লিঙ্গস্য বৈ মুনে।
ইতস্ততঃ সমালোক্য তা যযুর্ব্বরুণালয়ম্ ॥৪
তামালোক্য ক্রিয়াং দেবী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা।
সমাপ্তুং মনো দধ্রে ভবপ্রীতা মহামুনে ॥৫
তস্মিন্নেবদিনে তাস্তু পূজিতং লিঙ্গমুত্তমম্।
গাব সর্ব্বাঃ ক্ষীরবত্য আয়যুর্ব্বরুণালয়াৎ ॥৬
গবাং সহস্রাণি তাদৃষ্ট্বা গিরিরাজসুতা মুনে।
জগ্রাহ শিবভক্তা সা পালয়ন্তী চ নন্দিনী ॥৭
তামাশ্রিত্য জগন্মাতা রূপং তত্যাজ বৈ স্বকম্।
গোপীরূপং সমাচ্ছায় গোপালিন্যভবন্মুনে ॥৮
তাভ্যো দুগ্ধাপয়ঃ সর্ব্বং লিঙ্গে ত্রিভুবনেশ্বরে।
স্নাপয়ন্তী চ পয়সা ভক্ত্যা সা মুদিতা ভবৎ ॥৯
স্নাপয়িত্বা পয়োভিস্তং কুসুমৈঃ সুমনোহরৈঃ।
অর্চ্চয়ন্তী মুদে লেভে দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥১০

হে মুনিবর, একদা সেই গিরিরাজনন্দিনী পুষ্পাহরণ মানসে চঞ্চল, অলি-কুল-গুঞ্জরিত, কোকিলকুল নিনাদিত এক কাননে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই কাননের এক প্রদেশে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত রমণীয় পয়োধরশালিনী সহস্রসংখ্যক ধেনু দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর কুন্দকুসুম-প্রভা-বিনিন্দিত ধেনুগণকে এক শিবলিঙ্গের শিরোদেশ পয়োধারায় অভিসিক্ত করিতে দর্শন

করিলেন এবং ঐ ধেনু সকলকে শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া বরুণালয়ে গমন করিতে দেখিলেন। ভগবতী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাদৃশ ভগবৎসেবা সন্দর্শন করিয়া তদাহরণে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যেই পয়স্বিনী সহস্র ধেনু শিবারাধনা নিমিত্ত বরুণালয় হইতে পুনরায় তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। নগেন্দ্রনন্দিনী গোসহস্র দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপীরূপ ধারণ করিলেন এবং ধেনু সকলের রক্ষাণাবেক্ষণ জন্য যষ্টি অবলম্বন করিয়া গোপালিনী হইলেন। প্রতিদিন গো সকল দোহন করিয়া ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গকে স্নান করাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানা কানন হইতে কুসুমরাশি চয়ন এবং গো-দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ পূর্ব্বক অনাদিলিঙ্গের স্নান পূজাদি দ্বারা উপাসনায় পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে অনতিদূরে গোসাগর নামে এক কুণ্ড ও গোসাগরেশ্বর নামক অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির। গাভীগণ পীড়িত হইলে রোগ মুক্তির জন্য এখানে আনীত হয়। এই লিঙ্গোপরিই গো সহস্র দুগ্ধ দান দ্বারা সেবা করিত এবং পার্ব্বতী ইহাই দর্শন করেন। তিনি এই গোসহস্রের দুগ্ধ লইয়া ত্রিভুবনেশ্বরের সেবা করেন।

ভুবনেশ্বরের প্রাঙ্গনের একপার্শ্বে ভুবনেশ্বরীর। মন্দির ভুবনেশ্বরী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। গোপালিনীর ও ভুবনেশ্বরীর মন্দির পৃথক্। একাম্র পুরাণে গণেশ, কার্ত্তিক, সাবিত্রী, চণ্ডেশ্বর, অক্ষয়বট ও গোপালিনী উক্তি আছে।

পাদহরা পুষ্করিণী।

নিকটেই দেবী-পদহরা পুষ্করিণী। পুকুর গর্জাগরি করা। চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক শিব মন্দির। অনেকগুলিতে শিবলিঙ্গ আছে, অপরগুলিতে নাই। কথিত আছে যে কীর্ত্তি ও বাস নামক দুই অসুরকে বধ

করিবার নিমিত্ত দেবী পদদ্বারা তাহাদিগকে চাপিয়া ছিলেন ও পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া সরোবরে পরিণত হইয়াছে। শিবপুরাণে লিখিত আছে যে কীর্ত্তি ও বাস মহাসুরদ্বয় দেবীর গোপালিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মোহান্ধ হইয়াছিল। দেবী তাহাদিগকে বলেন যে যে ব্যক্তি আমাকে স্কন্ধে ও শীর্ষে উত্তোলন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন, আমি তাহারই ভার্য্যা হইব।

একাম্রকাননে বৃহৎ অম বৃক্ষ নাই। যে মহাবৃক্ষের ছায়ায় ঐ স্থান কানন স্বরূপ হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তথায় এতই শিবমন্দির যে পা বাড়াইবার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি ল্যাটারাইটময়, আর জঙ্গলও যথেষ্ট আছে। স্থানে স্থানে শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। কোন কোন স্থানে কেবল বালু-প্রস্তর খণ্ডসমূহ মন্দিরের আকারে সজ্জিত আছে। দুই পার্শ্বে কুচলার (Nux Vomica) বন। কএকটী মাত্র মন্দির এখনও দেবস্থান রূপে ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু ভুবনেশ্বরের কএকটী মন্দিরই এখনও সমস্ত জগতের দ্রষ্টব্য।

"গৌরী কেদার" মন্দির।

প্রধান মন্দিরের অদূরে "গৌরী-কেদার" মন্দির। গৌরীমন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভোপরি গরুড় ও গৌরীকুণ্ড। জল অতি পরিষ্কার। গৌরীমন্দিরের বাহিরে ভাস্কর কার্য্য অতি সুন্দর। কেদারেশ্বরের মন্দির সর্ব্বাংশে উড়িষ্যা রীতিতে নির্ম্মিত। গৌরী দেবীর মন্দিরও অতি সুন্দর। মন্দিরের সম্মুখস্থ গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে স্বামী কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর যত্নে পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে। পানীয় ও স্নানের জল অন্তঃশীল প্রস্রবণ বিনির্গত। পানীয় ও স্নানের কুণ্ড পৃথক্ জল খুব স্বাস্থ্যপ্রদ। ৺কেদারেশ্বর ও গৌরীদেবীর রীতিমত পূজা হইতেছে। দেব দেবীর যাত্রীও অনেক। অনেকেই তথায় মনোমত ফল প্রাপ্ত হন।

মুক্তেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর।

গৌরীকেদার মন্দিরের নিকটেই মুক্তেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, মুক্তেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে মুক্তেশ্বরের কুণ্ড। মন্দিরের প্রাঙ্গণ ল্যাটারাইট প্রস্তর নির্ম্মিত ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে দুই মন্দিরের ও কুণ্ডের জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। মুক্তেশ্বরের মন্দিরের অভ্যন্তরে অনেকগুলি বিচিত্র ভাস্কর কার্য্য এখনও ভারতশিল্পের পরিচয় দিতেছে। ভুবনেশ্বরের অন্য কোন মন্দিরের অভ্যন্তরে এরূপ ভাস্করকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। নবগ্রহের ও মাতৃকাগণের মূর্ত্তি যেন অল্পকাল হইল খোদিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা বলেন যে মুক্তেশ্বরের মন্দির একাম্রকাননের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বোধ হয় তাঁহারা ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিতে পান নাই; তজ্জন্যই তাঁহাদের এরূপ সংস্কার। তবে ইহাও ঠিক যে একাম্রকাননে অন্য কোন মন্দির না থাকিলেও মুক্তেশ্বরের মন্দিরেই দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হইত। প্রাঙ্গনের ভিতরই একটী ছোট কুণ্ড আছে, প্রবাদ যে তাহার জল খাইলে বন্ধ্যা গর্ভিণী হয়।

রাজা রাণী।

এই দুই মন্দিরের অনতিদূরে রাজারাণীর মন্দির। তথায় আর শিবলিঙ্গ নাই; তথায় আর মহাদেবের পূজা নাই। ব্রিটিশরাজের ব্যয়ে মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হইয়াছে। সকল মন্দিরের প্রবেশ দ্বারেই নবগ্রহ মূর্ত্তি। এখানেও তাই। গাঁথুনির প্রায় সমস্ত প্রস্তরই ল্যাটারাইট। কিন্তু যেখানে যেখানে জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে, সেখানেই সৌন্দর্য্য নাই।

কপিলেশ্বর।

প্রধান মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে কপিলেশ্বরের মন্দির। তথায় কপিলেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে ইনি ত্রিভুবনেশ্বর-মন্ত্রী। মন্দিরের গঠন প্রণালী অন্যান্য মন্দিরের ন্যায়। নিকটেই একটী সুন্দর

চতুষ্কোণ সরোবর আছে। সরোবরের স্নানঘাটের নাম মণিকর্ণিকা। সরোবর গজগিরি করা এবং ইহাতে জলের উৎস আছে। মন্দিরের অবস্থা এখনও বিশেষ মন্দ হয় নাই; কিন্তু সংস্কারের আবশ্যক। ভুবনেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত; কপিলেশ্বর দেবের একাম্রকাননে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই সকল মন্দির অবশ্যই দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কোন্ কোন্ মন্দির দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে তাহার সবিশেষ উল্লেখ নাই। মুরারি লিখিয়াছেন :—

"পুণ্যান্ শিবস্যান্যতমাংশ্চলিঙ্গান্,
বিলোক্য হর্ষেণ নমন্ পুনর্যযৌ॥"

তিনি মহাদেবের অন্যান্য পবিত্র লিঙ্গ দর্শন করিয়া সানন্দে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গমন করিয়াছিলেন।

জয়ানন্দ মিশ্রও বলিয়াছেন :—

"এক আম্র বনে উনকোটি-লিঙ্গ,
দেউল দেখিল কপিলেশ্বরে।"

বস্তুতঃ তাঁহার কপিলেশ্বরের মন্দির না দেখিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।

"সেই সব গ্রামে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
শিব লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

অন্যান্য শিবমন্দির।

একাম্রকাননের অনেক মন্দিরের কেবল ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিবলিঙ্গ স্থানান্তরে নীত হইয়া অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে পাণ্ডারাই অনেকে এই অনার্য্য কার্য্য করিয়াছেন। মন্দিরের প্রস্তর অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অসামান্য লিঙ্গকোটি-সনাথ প্রদেশে কিছু দিন না থাকিলে কেশরী রাজদিগের ধর্ম্মপ্রাণতা ও উদারতা,

এবং তৎকালের আর্য্যগণের সুরুচি ও শিল্পনৈপুণ্য বেশ বুঝিতে পারা যায় না।

একাম্রকাননে যে সকল শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান্ আছে তন্মধ্যে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌরীকেদার, কপিলেশ্বর, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও রাজা রাণীর কথা বলা হইয়াছে। আর কয়েকটীর কথা না বলিলে একাম্রকাননের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ভুবনেশ্বর ষ্টেসান হইতে ভুবনেশ্বর যাইবার রাজ পথের বামদিকে পথের অনতিদূরে কেশরী রাজদিগের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দ্রষ্টব্য। চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর ছিল; কূপ ও অন্যান্য জলাশয় ছিল, সুপ্রশস্ত অট্টালিকা ছিল। সিংহদ্বারের সিংহদ্বয়ের ভগ্নাবশেষ সামান্য দূরে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেখিলে কবির—'ত্যো রাজন্ গর্ব্ব পরিহর, স্মর স্মর পূর্ব্বভূপগণ কাহিনী' স্মরণ হয়। সে রাজবংশের লোপ হইয়াছে; প্রাসাদের লোপ হইয়াছে; গৌরব চিহ্ন অধিকাংশই বিলুপ্ত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ বংশ এখনও আছেন; তাঁহারা পাণ্ডা নহেন। তাঁহারা কেহ কেহ এখনও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ ও শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোযোগী।

রাজপথের আর একটু যাইয়া দক্ষিণ দিকে রামেশ্বর দেবের মন্দির। মন্দিরের অবস্থা শোচনীয় নহে। দেবপূজার এখনও ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের গঠন প্রণালী সকলই একই রকমের। ভুবনেশ্বরে রথযাত্রা চৈত্র পূর্ণিমায় হয়। রথটী খুব প্রকাণ্ড; প্রতিবৎসর প্রস্তুত হয়। সেই রথে ত্রিভুবনেশ্বরের চলিষ্ণু মূর্ত্তি রামেশ্বরের মন্দিরে নীত হন এবং তথায় মূর্ত্তি পূর্ণযাত্রা পর্য্যন্ত রাখা হয়। এই রথযাত্রায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়।

ষ্টেশন হইতে যাইতে রাজপথের দক্ষিণ দিকে বনের ভিতর নাগেশ্বর দেবের মন্দির। ইহার অবস্থা মন্দ হইয়াছিল। ইহার এক্ষণে সংস্কার হইতেছে। এখানে এখন পূজা হয় না। মন্দির দ্রষ্টব্য।

ইহার কিঞ্চিৎদূরে, বনের ভিতর ভাস্করেশ্বর দেবের মন্দির। মন্দিরের গঠন সুন্দর কিন্তু ইহাতে কারুকার্য্য নাই; সাদাসিধা। মহাদেবের মূর্ত্তি সুবৃহৎ; দ্রষ্টব্য।

অনতিদূরে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির ও কুণ্ড। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহা তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে ভুবনেশ্বরের যাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ উৎকলপ্রণালীর ভোগমণ্ডপাদিসহ মন্দির। বাহিরের কারুকার্য্য বিচিত্র। প্রাঙ্গনের চতুঃপার্শে ছোট ছোট অন্যান্য মন্দির বিদ্যমান। প্রাঙ্গন পাথরে বাঁধান। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, বাহিরে প্রশস্ত জলাশয়, কুণ্ড। প্রাচীরের বাহিরে ও কয়েকটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। স্থান নির্জ্জন, নিকটে বসতি নাই। মুক্তেশ্বরের মন্দিরের পরেই ইহার স্থান। এখানেও পূজা হয় না।

গৌরীকেদার মন্দিরদ্বয়ের সন্নিকটে পরশুরামেশ্বরের মন্দির। ইহার বাহিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে; এখানে এখনও মহাদেবের নিয়মিত পূজা হয়। এই মন্দিরের পার্শ্বে রাস্তার পরে শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আশ্রম। স্বামিজী মহারাজ আশ্রমটীকে রমণীয় করিয়াছেন।

পরশুরামেশ্বরের মন্দিরের নিকট হইতে যে পথ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছে তাহার ধারেই কোটিতীর্থেশ্বরের মন্দির। কুণ্ড আছে, কুণ্ডের খ্যাতিও আছে। মন্দিরে মহাদেবের নিয়মমত পূজা হয়।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপরদিকে পাণ্ডাদিগের পাড়ায় এক মন্দিরে কপালিনী মূর্ত্তি বিদ্যমানা। পার্শ্বেই মহাদেবের মন্দির। মুণ্ডমালাসহ দেবীর মূর্ত্তি ভীষণ বোধ হইলেও দ্রষ্টব্য।

ইহার অনতিদূরে গোসাগর ও অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির। গোসাগরের বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি। ইহা গোচিকিৎসার স্থান; গাভী পীড়িত হইলেই এখানে আনা হয়। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে যে পার্ব্বতী

স্বামীর অনুমতি লইয়া বারাণসী হইতে আসিয়া দেখেন যে প্রতিদিন পয়স্বিনী গোসহস্র গোসাগরে জলপান করে ও পার্শ্বস্থ অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের মূর্ত্তির দুগ্ধ দ্বারা সেবা করে। দেবী তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গোপালিনীবেশ ধারণ করিয়া পুষ্প ও দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের অনাদিলিঙ্গ মূর্ত্তির প্রত্যহ পূজা করিতেন। মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা বেশ ভাল নহে, কিন্তু মহাদেবের প্রত্যহ নিয়মমত পূজা হয়।

কিয়ৎদূরে যমেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। প্রাঙ্গন ও প্রাকার বেষ্টিত সুবৃহৎ মন্দির। চতুঃপার্শ্বে ও অনেক গুলি ছোট ছোট মন্দির। সকল গুলিরই অবস্থা শোচনীয়। নিকটেই গজগিরি করা সুবৃহৎ কুণ্ড। ইহারও অবস্থা শোচনীয়।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে কপিলেশ্বরে যাইবার পথে একটী দ্রষ্টব্য মন্দির আছে। ইহার অবস্থাও মন্দ। নিয়মমত পূজা হয় বলিয়া বোধ হয় না।

এই উনকোটিলিঙ্গ তীর্থে আরও অনেকগুলি অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষও দ্রষ্টব্য। যাহা আছে তাহাই শিল্প ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রমাণ দিতেছে। বুধ গয়ার তুলনায় ভুবনেশ্বরের স্থান অত্যুচ্চে। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির সহিত একাম্রকানন এখনও অপূর্ব্ব।

ভুবনেশ্বরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। প্রকৃতির রমণীয়তা প্রীতিকর, মানবের শিল্প নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। ম্যালেরিয়া জ্বর নাই, বিসূচিকা নাই, সংক্রামক রোগ নাই বলিলেই হয়। বর্ষা ও শীতকালে স্থান বিশেষ উপকারী। গ্রীষ্মকালে চিল্কা হ্রদের সামুদ্রিক বায়ু পাওয়া যায়। প্রায়ই খুব গরম হয় না। সময়ে ভুবনেশ্বরে অনেক বঙ্গবাসীই বাস করিবেন সন্দেহ নাই। এখনই অনেকে স্বাস্থ্যের জন্য যাইতেছেন। গৌরীকুণ্ডের পানীয় জল অতি উৎকৃষ্ট। অবগাহন স্নানের ও বেশ

সুবিধা আছে। বড়মানসী আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের ন্যায় জাতিভেদ নাই। গোয়ালা ও কাহারেরা ভোগ লইয়া যাইতেছে, ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতেছে। গাড়ি গাড়ি ভোগ নিকটস্থ গ্রামে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য প্রত্যহ নীত হইতেছে। কথিত আছে :—

"ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশঃ শূদ্রাঃ সর্ব্বে বর্ণাস্তথাশ্রমাঃ।
পংক্তিভেদো ন কর্ত্তব্যো ভেদঃ স্যাৎ নরকং ব্রজেৎ॥
নীলাদ্রৌ চৈব স্বর্ণাদ্রৌ তথা চ বেঙ্কটাচলে।
মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যমিতি পৌরাণিকী শ্রুতিঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণ তথা আশ্রমধারী কাহারই পংক্তিভেদ কর্ত্তব্য নহে। ভেদজ্ঞান হইলে নরকপ্রাপ্তি হইবে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরে ও বেঙ্কটাচলে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য আছে, এই পৌরাণিকী কথা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক দিন মাত্র একাম্রকাননে থাকিয়া তৎপর দিন বিন্দু-সরোবরে স্নান করিয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্র-অভিমুখী হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর এখন পুরীজেলার খুর্দ্দাবিভাগের অন্তর্গত। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে যাইতে হইলে ভুবনেশ্বর ষ্টেসন হইতে খুর্দ্দা জংসন ষ্টেসনে যাইয়া পুরীর শাখা রেলপথ দ্বারা পুরুষোত্তম যাইতে হয়। ভুবনেশ্বরে ও তন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার সীমান্ত প্রদেশ প্রায়ই লেটারাইটময় এবং সমতল ভূমিও আরক্তিম।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

ভুবনেশ্বর হইতে পুরী যাইতে অনেকটা পথই খুর্দা বিভাগের অন্তর্গত; ভার্গী (ভার্গবী), দয়া প্রভৃতি নদী ও তাহাদের শাখা প্রশাখা সনাথা সমতল ভূমি প্রতি বর্ষায় পলীমিশ্রিত জলে প্লাবিত হওয়ায় শস্যপূর্ণা। পুরী গমনের প্রধান রাজপথ সুন্দর; লেটারাইটময় মৃত্তিকায় নিরন্তর আরক্ত। ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভেও পথের অবস্থা অন্য প্রকার থাকা সম্ভব নহে; ভূমি চিরকালই সেই লেটারাইটময়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহচরগণ সহ রাজপথ অবলম্বন করিয়া ভুবনেশ্বর হইতে কাঠাতিপাড়া হইয়া কমলপুরে উপনীত হইলেন।

"ধরণী ছাড়িয়া, কাঠাতি পাড়া দিঞা
উত্তরিল কমলপুরে।"—শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র।

শ্রীবৃন্দাবন দাসও বলিয়াছেন :—

"এই মতে সর্ব্বপথে সন্তোষে আসিতে,
উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে।"

ভার্গবী নদী।

কমলপুরের পার্শ্বেই ভার্গবী বা ভার্গী নদী। ইহা সকল সময়ে নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে, বর্ষাকালে নৌযান-যোগ্য। শীত ও গ্রীষ্মকালেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় কমলপুরের নিকটে নিকটে যাওয়া যায়। ভার্গবী অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া চিল্কা হ্রদে মিশ্রিত হইয়াছে। বর্ষাকালে ইহা বিলক্ষণ স্রোতস্বতী। মুরারি গুপ্ত ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভার্গবীকে "মহাবীর্য্যবতী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কমলপুরে পৌছিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দের সহিত ভার্গবীতে অবগাহন স্নান করিলেন।

"নদীং মহাবীর্য্যবতীং স ভার্গবীং,
তস্যাং কৃতস্নানবিধিঃ পুনর্যযৌ।"—মুরারি।

তিনি স্রোতস্বতা ভার্গবী নদীতে স্নানবিধি সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন। তৎপরে তিনি দামোদর ও জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ কপোতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে গেলেন ;—

"কপোতসম্পূজিত-লিঙ্গমুত্তমম্"—মুরারি।

কপোতরূপেসম্পূজিতশ্রেষ্ঠতম শিবলিঙ্গকে দর্শন করিয়াছিলেন।

কপোতেশ্বর মহাদেব।

কপোতেশ্বর মহাদেবরে মন্দির কমলপুরের নিকটে। কথিত আছে যে মহাদেব তপস্যা করিয়া এরূপ শীর্ণ হইয়াছিলেন, যে তিনি একটী পায়রার মত হইয়া গিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তথায় তাঁহার কপোতেশ্বর নাম হইয়াছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরী গমন পথে মহাদেবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। মহাদেবের মন্দির উড়িষ্যা প্রণালীতে নির্ম্মিত, উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ইহাতেও চারিটী প্রকোষ্ঠ। শত শত বৎসরেও কপোতেশ্বর দেবের প্রসিদ্ধির হ্রাস হয় নাই, কিন্তু এখন অনেকেরই তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। তবে অনেক তীর্থ যাত্রী কপোতেশ্বর মহাদেবের পূজা না করিয়া উড়িষ্যার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ মনে করেন না। গোবিন্দদাস নিংরাজের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিয়াছেন :—

"অথৈতস্মাদ গচ্ছন কমলপুরমাসাদ্য ললিতং,
কপালেশং নত্বা বিধিবদিহ ভাগীরপনসৃং।
ততস্তং প্রাসাদং গুরুশিখরকৈলাসললিতং,
স্ফুরচ্চক্রং বাতপ্রচলিতপতাকং কলিতবান ॥"

অনন্তর গৌরচন্দ্র তথা হইতে কমলপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং কপালেশ মহাদেবের পুজা করিয়া ভাগী নদীতে বিধিবৎ স্নান করিলেন। তৎপরে গুরুশিখরকৈলাশপর্ব্বতের ন্যায় মনোজ্ঞ চক্রযুক্ত বাত-প্রচলিত-

পতাকাযুক্ত মন্দির দর্শন করিলেন। কবিকর্ণপুর সম্ভবতঃ কপোতেশ্বরকেই বলিয়াছেন।

দণ্ডভাঙ্গা।

কপোতেশ্বর মহাদেবের দর্শন গমনকালে মহাপ্রভু মুকুন্দের হস্তে নিজের সন্ন্যাসদণ্ড দিয়া যান। মুকুন্দ তাহা নিত্যানন্দকে রাখিতে দেন। নিত্যানন্দ কপোতেশ্বর দর্শন করিতে যান নাই। তিনি ভাগ্যবতী ভার্গবীর ধারেই ছিলেন; ভাবিলেন নিমাই সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-চিহ্ন "দণ্ড" তাঁহাকে আর ধারণ করিতে দিবেন না। তিনি দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ভার্গবীতে ভাসাইয়া দিলেন। খণ্ডীকৃত দণ্ড ভাসিয়া ভাসিয়া বোধ হয় চিল্কাহ্রদ পথ দ্বারা গমন করিয়া মহাসমুদ্রের মহোর্ম্মিবক্ষে কিছুদিন ক্রীড়া করিতে লাগিল। ভার্গবীও তদবধি "দণ্ডভাঙ্গা" নাম ধারণ করিল। ভাগীকে অনেকেই এখন দণ্ডভাঙ্গা বলেন।

এই দণ্ড-ভঙ্গ লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাম্প্রদায়িকগণ অনেক কথা বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে অনেক তর্কও হইয়াছে। আমরা সে তর্কে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নই। তবে পূজ্যপাদ কবিকর্ণপুর যাহা বলিয়াছেন—তাহাই উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব:—

> তদো কমলপুরণামংগামং লম্ভিঅ,
> কিঅণ ইসিণাণেভঅবদো
> দেব উলং পেক্খিদং অগ্গদো গচ্ছণ তস্মি
> দেবে, নিঅকরটঠিঅং দে অন্ন দণ্ডং
> নিচ্চাণন্দ দেরণ কিং এদেণ দণ্ডেণতি
> ভংজিঅ গইমজস্মি নিক্খিতো।"

অনন্তর কমলপুর গ্রামে আসিয়া নদীতে স্নান করতঃ ভগবান্ দেবকুল দেখিতে অগ্রসর হইলেন এবং নিত্যানন্দ ভগবানের দণ্ড লইয়া "ইহাতে কি প্রয়োজন" বলিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ নদীতে নিক্ষেপ করিলেন।

ষড়্ভুজ মূর্ত্তি।

তখন বর্ষাকাল, ভার্গবী তখন নৌযানে পার হইতে হইত। এখনও অনেক সময়েই পার হইতে নৌযানের আবশ্যক হয়। বর্ষাকালে এখনও কমলপুরে অনেক ব্যবসায়ী-নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সানুচর নৌযানে পার হইতে চাহিলেন। তদ্দেশ-প্রচলিত উপাখ্যান এই যে মাঝি প্রথমতঃ পারিশ্রমিক বিনা পার করিতে সম্মত হইল না—সে মূল্য চাহিল। সন্ন্যাসীগণ নিঃস্ব, তাহাদের কপর্দ্দকও নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাঝির সহিত কথা কহিতে কহিতে তাহাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। মাঝি তাহাতেও নরম হইল না। সে বলিল,—"ঠাকুর আমাদের দেশে অনেক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আছে, ইহা আর নূতন কি।" তখন মহাপ্রভু নাবিককে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন; ষড়্ভুজ মূর্ত্তিই উৎকলে বিশেষ আদৃত। বস্তুতঃ বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাই পুরাতন—সত্যযুগের। দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি বালগোপালের—ইহা বিরল; চৈতন্য মহাপ্রভু রেমুণায় ও সাক্ষী-গোপালে দ্বিভুজমূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। দ্বিভুজ মূর্ত্তি দ্বাপরের। তবে চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন কেন? কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন:—

> "ভুজৈঃ ষড়্‌ভিরেভিঃ সমায়াতি কশ্চিৎ,
> নিসর্গোগ্রষড়্‌ বর্গহন্তেতি ভোস্তাম্।
> বয়ং ক্রমহে হে মহেচ্ছস্ত্বমেভি-
> শ্চতুর্ব্বর্গদো ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আপনার ছয়টী হস্ত ষড়্‌রিপুবিনাশের চিহ্ন; ষড়্ভুজ দ্বারা আপনি উগ্র রিপুকে বিনাশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলি যে "চারিটী হস্ত চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ এবং অপর দুইটীর মধ্যে একটী ভক্তি-প্রদ ও অপরটী প্রেমপ্রদ।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ষড়্ভুজ দ্বারা উৎকলে ভক্তি ও প্রেম ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদায়িনী শক্তির প্রচার করিয়াছিলেন।

এক্ষণে পুরীর যাত্রীগণকে নৌযানে দণ্ডভাঙ্গা পার হইতে হয় না। বেঙ্গল-নাগপুরের রেলগাড়ী পোলের উপর দিয়া যাত্রীগণকে পুরীতে লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা আর দণ্ডভাঙ্গায় স্নান করিবার প্রায়ই অবকাশ পান না।

তুলসীচত্বর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অনুচরগণের সহিত ভার্গবীর অপর পারে পৌছিয়া তুলসী-চত্বর গ্রাম হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই হরিপ্রেমোন্মাদবশতঃ বাহ্যিক সংজ্ঞাবিহীন ও ভূমিতে পতিত হইয়া ধূলায় ধূসরিত হইলেন।

"ততোঽবলোক্যাম্পহরেঃ সুমন্দিরং শুভ্রং,
সুধানুলিপ্তং শরদিন্দুসুপ্রভম্।
রথাঙ্গযুক্তং পবনাদ্ধৃতাংশুকং,
বিভূষণং নীলগিরের্মহোজ্জ্বলম্॥
কৈলাসবাসং মুহুরাক্ষিপচ্চ
কান্ত্যা সমুচ্ছ্রয়তয়া সুধ.ম্না।
প্রভঞ্জনাকম্পিতচেলহস্তৈ-
রাহুয়মানং কমলেক্ষণং তম্।
পপাত ভূমৌ সহসা হতারিঃ"—মুরারি।

অরিশূন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সুধানুলিপ্ত, শরদিন্দুপ্রভ, রথাঙ্গযুক্ত বায়ুদোলায়িত, পতাকাসুশোভিত, নীলগিরির মহোজ্জ্বলভূষণ জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া অকস্মাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন শ্রীমন্দিরের উচ্চ বায়ু-বিকম্পিত শৃঙ্গ, সৌন্দর্য্যে কৈলাসগিরির শৃঙ্গকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পতাকারূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেছে।

"শ্রীদেউল ধ্বজমাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ আনন্দ সাগরে॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্ব-দেহ-ভার।"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

গোবিন্দ দাস (গোবিন্দ কামার) বলিয়াছেন মহাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থ তিনি সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাঁহার কড়চায়-লিখিয়াছেন'—

"ধ্বজ দেখি মহাপ্রভু পড়িল ধরায় ॥
এমন অশ্রুর বেগ দেখি নাই কভু।
পঙ্কিল করিল ধরা অশ্রু-স্রোতে প্রভু ॥
হা হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি।
ভাসাইল ভূমি. অশ্রুপাত করি ॥
আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে উভরায় কাঁদে।
সমুখে যাহারে দেখে বাহুপাশে ছাঁদে ॥"

মহাপ্রভু পুনরুত্থান করিয়া সহচরগণ সহ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে অৰ্দ্ধ শ্লোক—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।

বিকশিত-বক্ত্রারবিন্দ বালগোপালমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া হাস্যমুখে প্রাসাদাগ্রে বসিয়া আছেন। ভক্তির পরাকাষ্ঠায় আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি সাধারণ ইন্দ্রিয়চক্ষুর অদৃশ্য সহাস্য বালগোপালমূর্ত্তি বহুদূর হইতেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখিতে লাগিলেন।

ঐ দেখ কৃষ্ণ মোর নাচে গোপাল বেশে।
আহা মরি কত শোভা হইয়াছে কেশে ॥

আঠারনালা।

ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে চারিদণ্ডের পর তিনপ্রহরে অতিবাহিত করিয়া সকলেই আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন।

"আইলেন মাত্র প্রভু আঠারনালায়।
সর্ব্বভাব সম্বরণ কৈলা গৌর রায় ॥—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।
চলিতে চলিতে আইলা আঠারনালা।
তাঁহা পশি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

জগন্নাথদেব দর্শনার্থ সানুচর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্রুতগমন।

আঠারনালা পর্য্যন্ত আগমন করার পর তাঁহার কথঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইল। সেকালে আঠারনালা পুরুষোত্তম প্রদেশের দ্বার ছিল। বস্তুতঃ আঠারনালা হইতেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র আরম্ভ। আঠানালা পার হইয়াই পবিত্রভূমি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আঠার নালা অষ্টাদশ পুরাণের চিহ্নস্বরূপ। আঠারনালা পার হইলেই হরিপ্রেমের বৃন্তে প্রবেশ করা যায়। নিত্যানন্দ, দামোদর, জগদানন্দ ও মুকুন্দ সকলেই প্রেমাবিষ্ট, কিন্তু আঠারনালায় আসিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিলেন—"আমরা, ত পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এখন কিরূপে, কি উপায়ে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি।" সেই চিন্তায় তাঁহারা ক্ষণকালের নিমিত্ত চৈতন্যদেব সহ সাধারণ মানুষিক ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহাদের গোপীনাথ আচার্য্যের কথা মনে পড়িল। তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। সার্ব্বভৌমের পুরীতে অসীম ক্ষমতা, তিনি রাজার বিশেষ আদরের পণ্ডিত; পাণ্ডিত্যেও অতুলনীয়। তিনি বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া প্রতাপরুদ্রের আগ্রহে পুরীতেই থাকেন!

"অস্ত্যত্র বিশারদস্য জামাতা সার্ব্বভৌমস্যা আবুত্তো ভগবতঃ পরমাপ্ততমো গোপীনাথাচার্য্যো যঃ খলু ভগবতো নবদ্বীপ-বিলাসবিশেষাভিজ্ঞঃ।"—কবিকর্ণপূর।

এখানে বিশারদের জামাতা, সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি, গোপীনাথ আচার্য্য আছেন। তিনি ভগবানের বিশেষ আত্মীয়, ভগবানের নবদ্বীপ বিলাসের কথা বেশ জানেন। সকলে স্থির করিলেন তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে পথ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে আঠারনালা পুরী যাইবার পথে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা এখনও দ্রষ্টব্য। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে পুরীর যাত্রীগণের নিকটে শুল্কগ্রহণ করা হইত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন, তখন হিন্দুরাজচূড়ামণি

প্রতাপরুদ্র যাত্রীগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন না। তখন (Pilgrim tax) হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিক্‌দল ছিলেন, তাঁহারা এখানে শুল্কগ্রহণ করিতেন। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ন্যায়পরায়ণ হইয়া তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও সেখানে টেক্স দারোগার ঘর দেদীপ্যমান থাকিয়া হীনমতিত্বের আদর্শ রহিয়াছে। এখনও তথায় হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষিগণের বিদ্বেষের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার কি পুরীর "Pilgrim tax" হইবে? বলা যায় না! যাহা হউক, আঠারনালা হিন্দুদিগের শিল্পনৈপুণ্যের একটী স্থায়ী চিহ্ন। কতশত বর্ষ অতীত হইয়াছে; মধুমতী নদীর কতশত বর্ষের বর্ষার জলের স্রোত এই আঠারটী নালায় ঘাত প্রতিঘাত করিয়াছে, কতকাল সূর্য্যরশ্মি ও বারিবর্ষণ ইহাকে আক্রমণ করিতেছে, কিছুতেই ইহার ক্ষতি করিতে পারে নাই। মুটিয়া (মধুমতী) নদী এককালে বর্ষায় খুব স্রোতস্বতী হইত এবং পার হইতে যাত্রীগণের বিশেষ কষ্ট হইত। জগন্নাথদেব-দর্শনাকাঙ্ক্ষীদিগের পুরী গমন পথ সুগম করিবার জন্য রাজা মৎস্যকেশরী ১০৩৮ হইতে ১০৫০ খ্রীঃ মধ্যে আঠারনালা নির্ম্মাণ করান। সেকালের পক্ষে ইহার শিল্পনৈপুণ্য এরূপ ছিল যে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ইহা নির্ম্মাণ করেন। নদীর স্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে কিন্তু আঠারটী খিলান হিন্দুদিগের পূর্ত্তবিভাগের অক্ষত নিদর্শনস্বরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কটক সহরের কাট-জুড়ীর পোস্তা-"Rivetment" যেরূপ কীর্ত্তি, যাজপুরের এগারনালা ও পুরীর আঠার নালা ও তদনুরূপ কীর্ত্তি। প্রবাদ আছে যে সহস্র নরমুণ্ড প্রোথিত হইয়া আঠারনালা প্রস্তুত হইয়াছিল। সে কথা যে মিথ্যা তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। অন্যান্য নদীতে সাঁকো প্রস্তুতের সময় এইরূপ নরমুণ্ড স্থাপনের প্রবাদ আছে। বলা বাহুল্য যে আঠারটী ফোঁকরই (নলাই) প্রস্তর নির্ম্মিত। পাথরগুলি কি মসলায় জোড়া তাহা বলা যায় না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটী খিলানের একটী পাথরও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।

নরেন্দ্র সরোবর।

দ্রুতবেগে যাইবার সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পথিমধ্যে বোধ হয় নরেন্দ্র সরোবর লক্ষ্য করেন নাই। সরোবর বিস্তীর্ণ, মধ্যে উৎকল প্রথামত দ্বীপবৎ ভূমিখণ্ড ও মন্দির। তৃতীয়বার পুরীতে আসিয়া তিনি এই সরোবরে জলক্রীড়া করেন।

পুরী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দুরন্ত পথ ভ্রমণ করিয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পৌঁছিলেন। বহুদিনের পথশান্তির আপাততঃ অবসান হইল। চিরেপ্সিত জগন্নাথদেবের দর্শন এখন সহজ হইল। আঠারনালায় যাইয়া স্থির করা হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথক্ যাইবেন। তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন। দূর হইতে আসিয়া ধূলিপাদে (ধূল পায়ে) দেব দর্শন করা আচার-প্রসিদ্ধ; চৈতন্যদেব আঠারনালা হইতে এক দৌড়ে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং ওঁকার মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করিয়া ভক্তি ও প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

> আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
> জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে।
> জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইঞা।
> মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইঞা॥—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

গোপীনাথ আচার্য্য তখন শ্রীমন্দিরে ছিলেন না; বাসুদেব সার্ব্বভৌম ছিলেন, কিন্তু তিনি নবদ্বীপের নিমাইকে চিনিতেন না। যাহা হউক তাঁহার উপস্থিতি হেতু প্রহরীগণের বেত্রাঘাত স্থগিত হইল। তাহার পর মহাপ্রভুর অচৈতন্য দেহ সার্ব্বভৌমের বাটীতে নীত হইল। তথায় তাঁহার শিষ্য ও সহচরগণ মিলিত হইলে গোপীনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারও হরিনাম কীর্ত্তনে চৈতন্য হইল। তাহার পর সমুদ্রে স্নান।

চক্রতীর্থ।

তিনি অনুচরগণ সহ চক্রতীর্থে স্নানার্থ গমন করিলেন।

"চক্রেণ চক্রে স্বয়মুগ্রচক্রিণা
তীর্থে মহেশায় সুদীপ্তমত্তমে।
স্নাত্বা চ তস্মিন্ শিবলোকমাপ্তা-
স্তত্রাশু গত্বা বিধিবচ্চকার॥
স্নাত্বা ততঃ শঙ্করলিঙ্গমীশ্বরো
জপন্নঘোরং প্রণনাম দণ্ডবৎ।
স্তুত্বা মহেশং স্তুতিভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্জগাম যজ্ঞেশমহালয়ং প্রভুঃ॥"—মুরারি

যে স্থানে স্নান করিয়া মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয়, উগ্রচক্রী ভগবান সেই চক্রতীর্থে স্নান করিয়া মহাদেব দর্শন পূর্ব্বক যথাবিধি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদনন্তর পরমেশ্বর যোগাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শঙ্করলিঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন এবং মঙ্গলময় শিবস্তোত্রাদি দ্বারা স্তব করিয়া বৃহদায়তন যজ্ঞেশ্বর মন্দির দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।

চক্রতীর্থ বালগণ্ডি নালার ধারে মহোদধির তীরে। অনতিদূরে চক্র-নারায়ণের মন্দির। এক্ষণে চক্রতীর্থ একটী স্বমিষ্ট জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। প্রবাদ এই যে চক্রতীর্থের ধারেই ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়াছিল এবং সেই ব্রহ্মদারু দ্বারা জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রথম গঠিত হয়। স্বর্গদ্বারে প্রথম স্নান করার নিয়ম; কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভু স্বর্গদ্বারেই প্রথম সমুদ্রস্নান করেন। স্বর্গদ্বার পুণ্যতীর্থ; কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কোন স্থানে মহাসমুদ্রে স্নান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহোদধির ধারে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে ভাবুক হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাবিষ্ণু স্বয়ং রহিয়াছেন, সেখানে বিষ্ণুর অনবধারণীয় মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও উল্লাসিত না হওয়া

অসম্ভব। মহাসমুদ্রের সীমান্ত-রহিত নীলাভ-মূর্ত্তি দর্শনে কাহার মন মহিমা-পূর্ণ হইয়া বিস্ফারিত না হয়।

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্থানমবধারণীয়ম্
ঈদৃক্তয়ারূপমিয়ত্তয়া বা।"—রঘুবংশ।

ইহার গর্ভে ভগবানের অবস্থান ইত্যাদি বহুবিধ মহিমায় মহাসমুদ্র দশদিকেই সুপরিচিত; ইহার জগতে অসীম প্রভাব; ইহা ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় চিন্তার অতীত।

মহাসমুদ্র কেবল সীমাশূন্যবিস্তারেই মহিমাগুণে মনকে আকর্ষণ করে না। যখন বায়ুর প্রাবল্য নাই, তখনও উর্ম্মিকলাপ ধারাবাহিকরূপে একের পর আর একটী আসিয়া বেলাভূমি আক্রমণ করিতেছে। তরঙ্গমালা দেখিয়া মনে হয়:—

বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গাঃ
মহোর্ম্মিঃ বিস্ফূর্জথু নির্বিশেষাঃ
সূর্য্যাংশু সম্পর্ক সমৃদ্ধ রাগৈঃ-
ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।"—রঘুবংশ

বেলাভূমির বায়ু সেবন মানসে ভুজঙ্গগণ যেন সাগরগর্ভ হইতে তীরাভি-মুখে ধাবিত হইল কিন্তু সেই নীলাম্বুরাশির তরঙ্গ সংক্ষোভে সংলক্ষিত হইতেছে না; কেবল সূর্য্যকিরণসম্পাত সমুজ্জ্বল মণিপ্রভায় ইহাদিগকে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

প্রতি হিল্লোলের উপর যেন সহস্র সহস্র গোখুরা সাপ ফণা তুলিয়া বেলাভূমির বালুকার দিকে ধাবমান হইতেছে, কিন্তু বালুকাস্পর্শমাত্র সকলেই যেন মহামন্ত্রের বলে মহাসাগরেই নিমীলিত হইতেছে; সে তরঙ্গই বা কোথায় —সর্পফণারাশিই বা কোথায়!

"তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত,
সাগর লহর সমানা।"—বিদ্যাপতি।

নীলনলিনাভ জলরাশিতে সূর্য্যরশ্মিই বা কি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়া থাকে। হিমালয়ের উচ্চ শিখর প্রদেশে কাঞ্চিনজঙ্ঘা সূর্য্য-রশ্মিতে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান; ইহা সুদৃশ্য ও সুরম্য। কিন্তু নীলিমাময় তরঙ্গমালায় আলোড়িত মহাসমুদ্রের কি মহিমা; সহস্র সহস্র অর্ণবপোতেও সে নীলিরাশির কিছুই করিতে পারে না। আবার মহাসমুদ্রে দিবারাত্রি ঝড়ের শব্দ—মেঘ-নিস্বন বা দূর হইতে শ্রুত বাষ্পীয় রথের শব্দ। মহাপ্রভুর অনুচর গোবিন্দ দাস (কামার) যে ভাবে বেলাভূমি দেখিয়াছিলেন তাহা এই:—

"পর্ব্বত কানন আদি নাই সেই ঠাই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই॥
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেইখানে।
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে॥
সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত।
ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত॥
পর্ব্বত সমান হালি হৈয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥

আঠার নালা হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর যে দশা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মুরারি বলিয়াছেন—

"প্রাসাদমালোক্য জগৎপতের্মুহু-
র্মুহুঃ স্রবন্ নেত্রজবারিধারয়া।
শুভ্রঃ সুমেরোরিব নির্ঝরান্বিত-
স্তাৰ্থং স্বকণ্ঠোদ্গমবৎ সুতপ্ত॥"

বিশ্বপতির সমুন্নত সৌধশিখর দর্শন করিয়া তিনি নয়নাসারসিক্তদেহ হইয়াছিলেন। প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছিল। তদীয় ধারা-বিগলিত দেহ সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় দেখাইয়াছিল।

শ্রীমন্দিরে বলরাম ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথদেবকে দর্শনার্থ গমনপথে তাঁহার যে দশা হইয়াছিল তাহাও মুরারি বলিয়াছেন :—

"প্রহৃষ্টরোমা নয়নাম্বুধারিভিঃ
পরীতবক্ষাঃ পরমাত্মচিন্তয়া।
বিবেশ দেবেশগৃহং মহোৎসবং
ননাম দৃষ্ট্বা জগতাং পতিং প্রভুম্॥"

তিনি নয়নাম্বু-নিঃসৃত ধারাসংপৃক্ত বক্ষে পরমাত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রেমরসের উৎসপূর্ণ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক জগন্মোহন দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়াছিলেন।

অরুণস্তম্ভ।

নীলাচলের পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই দ্বারের নাম "সিংহদ্বার", কারণ দ্বারের উভয় পার্শ্বে সিংহ-মূর্ত্তি আছে। এক্ষণে সম্মুখে অরুণ-স্তম্ভ। স্তম্ভের মধ্যভাগ ষোড়শাস্র। পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব স্তম্ভ অর্কক্ষেত্রে সূর্য্য মন্দিরের সম্মুখে ছিল। কথিত আছে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজত্বকালে ইহা তথা হইতে আনীত হইয়া সিংহদ্বারের সম্মুখে স্থাপিত হয়। কোনার্ক হইতে এরূপ স্তম্ভ আনয়ন করা সহজ নহে, কিরূপে ও কত ব্যয়ে আনীত হইয়াছে তাহা এখন অজ্ঞাত। যাহা হউক, এই অরুণস্তম্ভ দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহা প্রায় ২২ হাত উচ্চ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কোনার্কে গিয়াছিলেন কি না প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি হিন্দুকীর্ত্তি অরুণস্তম্ভ দেখেন নাই। শ্রীমন্দিরেরই বা তিনশত বৎসরে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও বলা যায় না।

নীলাচল।

নীলাচলক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে লাটারাইট প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীর উচ্চে প্রায় ১৬ হাত। যাজপুরের বিরজাদেবীর মন্দির এবং একাম্রকাননে ভুবনেশ্বরের মন্দিরও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত। কিন্তু সে সকল প্রাচীরের অবস্থা এখন ভাল নয়। নীলাচলের প্রাচীর সুন্দর অবস্থায় আছে। এই বিশাল প্রাচীর গঙ্গবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেব নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল সিংহদ্বারের শিল্পনৈপুণ্যই হিন্দুকীর্ত্তির যথেষ্ট পরিচায়ক। উপরের ছাদ 'পিরামিড' আকারে নির্ম্মিত; প্রশস্ত দরজা কৃষ্ণক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত ও বহুবিধ কারু-কার্য্যে মণ্ডিত। কপাট দুইটী শাল কাষ্ঠের। প্রবেশ দ্বারের উপরেই নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত। উড়িষ্যার প্রায় সকল মন্দিরের দ্বারের উপরেই রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুর খোদিত মূর্ত্তি আছে। গ্রহগণ সর্ব্বত্র দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ফলিতজ্যোতিষের মতে মানবজীবনের উপর তাঁহাদের অপরিহার্য্য ক্ষমতা। উড়িষ্যার প্রচলিত রীত্যনুসারে দ্বারদেশেও জয় ও ও বিজয়ের মূর্ত্তি যেন জীবন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সোপান।

পূর্ব্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া বামভাগে "শ্রীকাশী বিশ্বনাথ" ও "শ্রীরাম-চন্দ্র" মূর্ত্তি। প্রবেশ-পথ ও সোপান সর্ব্বদাই কোলাহলময়। তাহার পর নীলাচলে উঠিবার প্রস্তরময় সোপান। ২২টী পৈঠা উঠিয়া শ্রীমন্দিরের

শ্রীমন্দির।

প্রাঙ্গণের মধ্যেই বিশাল আকাশভেদী শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকের সিংহমূর্ত্তিযুক্ত দৃশ্যের শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য বর্ণনাতীত। এই কারু-কার্য্যেই কত সহস্র টাকা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে! শোভাই

বা কি! বর্ত্তমান মন্দিরের প্রধান প্রধান অংশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সময়ের পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য রীত্যনুসারে মন্দির চারি অংশে ✓ বিভক্ত। পূর্ব্বদিকে ভোগমণ্ডপ, তৎপশ্চিমে নাটমন্দির, তাহার পর জগন্মোহন বা মোহন এবং সর্ব্ব পশ্চিমে জগন্নাথদেবের মূল মন্দির। মন্দিরের চারিটী অংশই বিলক্ষণ প্রশস্ত। ভোগমণ্ডপ ৫৮×৫৬ ফিট। দেওয়ালে অতি সুন্দর কারুকার্য্য, ছাদ দেখিতে চতুষ্কোণ "পিরামিডের" ন্যায়। এখানে অন্নভোগ হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময়ই ভোগ-মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ! নাটমন্দিরও বিলক্ষণ প্রশস্ত—ইহা ৮০×৮০ ফিট। চারিদিকে চারিটী দ্বার; পূর্ব্ব দ্বারে জয় ও বিজয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। দেওয়াল অলঙ্কৃত। মোহন ও ৮০×৮০ ফিট; ছাদ ১২০ ফিট উচ্চ, ইহার চতুর্দ্দিকে কারুকার্য্য দ্বারা দেওয়ালে অঙ্কিত দেবমূর্ত্তি ও পুরুষোত্তমদেবের দক্ষিণবিজয়ের প্রতিলিপি। কৃষ্ণলীলারও অনেক প্রতিলিপি আছে। মূল মন্দিরও ৮০× ৮০ ফিট। মন্দিরের চূড়া ১৯২ ফিট উচ্চ। এরূপ উচ্চ চূড়া অতি বিরল।

গরুড়স্তম্ভ।

মহাপ্রভু শ্রীমন্দির দর্শন করিয়াই ভক্তিভরে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া হৃদয়ের আবেগে প্রথমতঃ সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। এই স্তম্ভ "মোহনের" ভিতর—ইহাতেও বিলক্ষণ শিল্পনৈপুণ্য; এমন কি আর কিছু না দেখিলেও জগন্নাথদেবের সম্মুখস্থ বৈনতেয়কে দেখিলেই তৃপ্ত হইতে হয়।

গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্তবহিতে লাগিলা॥—গোবিন্দ দাস।

মহাবিষ্ণুদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভীপ্সিত মহাবিষ্ণু দর্শন করিলেন। বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শনচক্র, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া কাহার না

ভক্তির উদ্রেক হয়? পুরীর শ্রীমন্দিরে হিন্দু ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। কোন হিন্দুর মহাবিষ্ণু দর্শনে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন শান্তিরসে আর্দ্র না হয়? ভক্তির আলয়—বিষ্ণুপ্রেমের উৎস—মহাপ্রভুর কি দশা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

"পপাত ভূমৌ পুনরেব দণ্ডবন-
নমন্ মুহুঃপ্রেমভরাকুলাননঃ।
ততঃ ক্ষণান্মুষ্টিকরং বিভাবয়ন্
জগৎপতিং সোহতিতরাং রোদ বিহ্বলঃ॥"—মুরারি।

তৎপরে তিনি প্রেমবিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে জগৎপতির হস্তপাদাদি দর্শন করিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন।

"হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সংকর্ষণ॥

পাকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝায় ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র॥" —শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

"দৃষ্ট্বোল্লসদ [illegible] যষ্টিঃ **
প্রেমাশ্রুবারিঝরপূরিতপীনবক্ষাঃ।
বক্ষোপান্ত প্রচুরবারিযুতেন্দুবক্ত্রো
হেমাদ্রিশৃঙ্গ ইব বাতকৃতঃ পপাত॥
ভূমৌ মুমোহ ভগবান্ কৃতমুষ্টিহস্তো
বিস্রস্তবস্ত্রবসনো বিবশং বিদিত্বা।
তং তে দ্বিজাঃ সপদি বাহুযুগেন ধৃত্বা
কৃষ্ণাজ্ঞতোঃ ভবনতঃ পরতো নিনিন্যুঃ॥"—মুরারি।

** পাঠের দোষ আছে; স্পষ্ট ছন্দের দোষ।

† পাঠের দোষ আছে।

জগন্নাথ দর্শনে বিহ্বলদেহ চৈতন্যদেব স্থূল বক্ষঃস্থল প্রেমাশ্রু ধারায় সিক্ত করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে বাতাহত হিমালয়শৃঙ্গের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। ভগবান্ ভূপতিত হইয়া বিশ্রস্তবাসাঃ হইলেন। ক্রমে তাঁহার হস্তমুষ্টি দৃঢ় হইল। নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ তদ্দর্শনেআকুল হইয়া তৎক্ষণেই দেহযষ্টি ধারণপূর্ব্বক অন্যত্র লইয়া গিয়াছিলেন।

দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

মুরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া।
যেন মৃত দেহ তথি রহিল পড়িয়া॥

—গোবিন্দ দাস।

জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইঞা।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥

—চৈতন্য চরিতামৃত।

রত্নবেদী।

রত্নবেদীর উপর উত্তরদিকে ওঁকাররূপী জগন্নাথদেব। অপরদিকে শুভ্রকান্তি হলধরের চিহ্নস্বরূপ অপর ওঁকারমূর্ত্তি। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ভ্রাতৃ-বৎসলা অভিমন্যু-মাতা সুভদ্রা। রত্নবেদীর এক পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত চাকচিক্যময় সুদর্শনচক্র। কারুময় মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের সম্মুখে সুবর্ণ-নির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তিও বিরাজমানা। রজতময় ভূদেবীর মূর্ত্তি ও অপর কয়েকটী পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তিও তথায় বিদ্যমান। জগন্নাথ ও বলরামের হস্তদ্বয় দেখিয়া বোধ হয় যেন পাপীগণকে পঞ্জরস্থ করিয়া উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই ওঁকারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রসারিতহস্ত রহিয়াছেন। সুভদ্রাদেবীর হস্ত

নাই। বলদেবের মূর্ত্তি ৮৫ যব, জগন্নাথের ৮৪, সুভদ্রার ৫৪, সুদর্শনের ৮৪ ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ৪ যব মাত্র। সুভদ্রার হস্ত না থাকা সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তাঁহার হস্ত সমুদ্রের ঘোর গর্জ্জনের ভয়ে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। জগন্নাথ দেবের দক্ষিণে রজতময় শুভ্রকান্তি সরস্বতী ও বামে সুতপ্তচামীকরবর্ণা লক্ষ্মী। পশ্চাতে নীলমাধব ও তৎপশ্চাতে সুদর্শনচক্র, এই সপ্ত মূর্ত্তি রত্নবেদীর অপ[illegible]। রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিতে দিবাভাগেও দীপালোক প্রয়োজন, কারণ [illegible] পশ্চাদভাগ অন্ধকারাবৃত। মন্দিরাভ্যন্তরে চারিদিকে খোদিত দেবলীলার ছবি; অনেক গুলিই শ্রীমদভাগবত হইতে। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেবের বিজয়কীর্ত্তিরও ছবি আছে। প্রত্যেক ছবিই ভাল করিয়া দেখার উপযুক্ত। অনেক গুলিই যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই খোদিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাপ্রভু সে সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া নিশ্চয়ই অসীম প্রেমভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবেন।

মন্দিরের বহির্ভাগ।

মন্দিরের বহির্ভাগও প্রস্তরখোদিত ভাস্কর কার্য্যে পরিপূর্ণ। দেব-দেবীর চিত্র, যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র, সাধারণ মানবদিগের দৈনন্দিন ক্রিয়ার চিত্র দ্বারা মন্দিরের বহির্ভাগ ব্যাপ্ত। চিত্রসমূহের মধ্যে অশ্লীলতারও অসদ্ভাব নাই। তিনশত বৎসরে মানবরুচির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু অশ্লীল চিত্রের কারণ নিদর্শন করা কঠিন। অনেক পণ্ডিত বলেন, মন্দিরের বহির্দ্দেশে অশ্লীল মূর্ত্তির উদ্দেশ্য এই যে, দেব দর্শনার্থ যাঁহারা যাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অশ্লীল মূর্ত্তি দর্শনে যদি মনের বিকার না হয় তবেই তাঁহারা দেবদর্শনের উপযুক্ত। যাঁহারা বিচলিত হন তাঁহাদের দেবদর্শনে ফল নাই। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং হি চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—কুমারসম্ভব।

বিকারহেতু উপস্থিত থাকিলেও যাহাদের মন বিচলিত হয় না তাহারাই ধীর।

ভাস্করগণ এই উদ্দেশ্যেই মন্দিরের বহির্দ্দেশে অশ্লীল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে।

প্রাঙ্গণ।

শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাঙ্গণ প্রস্তরাবৃত। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ২৭০ হাত ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮৫ হাত। মধ্যস্থলে প্রধান অর্থাৎ শ্রীমন্দির এবং চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দিরাদি। প্রত্যেক দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তিই দর্শনীয় এবং পুরীযাত্রীমাত্রই তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া থাকেন। কোন্ সময়ে কোন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, কোন্ সময়ে কোন্ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা প্রায়ই বলা যায় না।

কেশরীরাজ যযাতি-কেশরীর সময় হইতে পুরীর ইতিহাস তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এই ইতিহাসের নাম মাদ্‌লাপঞ্জী। এই তালপত্রপঞ্জীতে লিখিত আছে যে যযাতি-কেশরী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বালুকারাশি হইতে পুরাতন জীর্ণ শ্রীমন্দির ও দারুময়ী মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের আবিষ্কার করেন। তিনি পুরাতনের অনুকরণে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, ৪৮৭ অব্দে শ্রাবণ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে নূতন মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত করেন। যযাতিকেশরীর আদেশানুসারে তদবধি বর্ত্তমান মহাপ্রসাদের নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী রাজবংশ অর্থাৎ গঙ্গবংশ উড়িষ্যার রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় পুরীর শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে শ্রীমন্দিরের পুনঃ সংস্কার হইয়াছিল।

> শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
> প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥

ধীমান্ অনঙ্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৯৮ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। সুতরাং প্রধানাংশ সমূহ সাতশত বর্ষের পুরাতন।

পরেও সময়ে সময়ে জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। কালস্রোত ও কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্য শ্রীমন্দিরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ দেবমন্দিরাদি।

শ্রীমন্দিরের অগ্নিকোণে, প্রাঙ্গণের অপরদিকে, চতুর্ভুজ শ্রীবদরীনারায়ণ মূর্ত্তি এবং তাহার পরই পুরাতন পাকশালার দ্বার। তৎ পশ্চিমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজমান। পুরাতন পাকশালার পশ্চিমভাগে অক্ষয়বট।

অক্ষয়বট।

প্রায় সমস্ত পুরাতন হিন্দুতীর্থেই অক্ষয়বট বর্ত্তমান আছে। পৌরাণিক বা বৌদ্ধ, হিন্দুধর্ম্মের উভয় শাখারই বটবৃক্ষ পূজ্য। বুদ্ধগয়ার মহাবোধিদ্রুম উভয় শাখারই পূজ্য ; মহাবোধিদ্রুমের তলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই বোধিদ্রুমের শাখা এখনও সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অক্ষয় চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বুধগয়ার মূল বৃক্ষ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াও এখনও পৌরাণিক ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার হিন্দুরই তীর্থ-চিহ্ন। পৌরাণিক হিন্দু বৃক্ষতলে পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদান করেন এবং বৌদ্ধগণ তাহার পূজা করেন। গয়ার অক্ষয়বট, যাজপুরের ধর্ম্মবট ও ভুবনেশ্বরের কল্পবৃক্ষ দেশ প্রসিদ্ধ। অক্ষয়বট ও কল্পবৃক্ষ নারায়ণাংশ স্বরূপ। কথিত আছে মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রলয়কালে এই বটবৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। বটাশ্বত্থ যে সকল শ্রেণীর হিন্দুরই পবিত্র বৃক্ষ তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহের কারণ নাই। গয়ার মহা-বোধিদ্রুম কেবল বৌদ্ধদিগের পূজ্য, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক বা পৌরাণিকগণের ও বৌদ্ধগণের অনেক বিষয়ে এরূপ সাদৃশ্য ছিল যে এককালে উভয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের বিভিন্নতা যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

পুরীর অক্ষয়বটমূলে মঙ্গলাদেবী বিরাজমানা ; ইনি অষ্টশক্তির অন্যতমা। শ্রীবটেশ্বর ও বৃক্ষমূলে স্থাপিত এবং নিকটেই বটকৃষ্ণ মূর্ত্তি। ঈশান কোণে

শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর-লিঙ্গ। তৎপূর্ব্বদিকেই বটপত্রশায়ী বালমুকুন্দ। শ্রীমার্কণ্ডেয়-শ্বর-লিঙ্গের উত্তরে "ইন্দ্রাণী"। নিকটেই সূর্য্যমূর্ত্তি। এইখানেই প্রকোষ্ঠের দক্ষিণদ্বার— এই দ্বারের নাম "অশ্বদ্বার"।

মুক্তিমণ্ডপ।

ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখ হইলে ক্ষেত্রপাল, মুক্তিমণ্ডপ, লক্ষ্মী-নৃসিংহ, বিনায়ক ও রোহিণীকুণ্ড-ভূষণ্ডীকাকের মূর্ত্তি দেখা যায়। কথিত আছে যে প্রতাপরুদ্রদেব ১৫২৫ খৃঃ অব্দে মুক্তিমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মণ্ডপ বিলক্ষণ প্রশস্ত—দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় ২৪ হাত হইবে। এই মণ্ডপে বসিয়া পণ্ডিতগণ যাত্রীদিগকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইয়া থাকেন। এখানে প্রায়ই শাস্ত্রপাঠ হইতেছে। প্রবাদ যে ভূষণ্ডীকাক রোহিণীকুণ্ডে অবগাহন করিয়া নীলনাথকে দর্শন করেন এবং দর্শনে পুণ্যশরীর হইয়া চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন।

বিমলা মন্দির।

অনতিপরেই বিমলাদেবীর মন্দির। এই মন্দির হিন্দু বা অহিন্দু সকলেরই দ্রষ্টব্য; তবে অহিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। গঠনপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় ইহা গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের প্রথম আমলে শ্রীমন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে বা অনতিপরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবী অষ্টশক্তির অন্যতমা; মহাষ্টমীর রাত্রিকালে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের শয়নের পর দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হয়। পুরীর মন্দিরে এই একমাত্র পশুহত্যার চিহ্ন আছে। বিমলাদেবীর নামেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অপর নাম —"বিমলা-ক্ষেত্র"। এই মন্দিরের ভিতর প্রায়ই যাত্রীসংখ্যা অধিক, অথচ মন্দিরাভ্যন্তর প্রায়ই অন্ধকারময়। মূল মন্দিরের সম্মুখের প্রকোষ্ঠের শিল্প-

নৈপুণ্য চমৎকার; ছাদের অধস্তলে আশ্চর্য্য ভাস্কর-হস্ত-খোদিত চিত্রসমূহ—চিত্রগুলি দেখিলে তৎকালের দেশাচারের অনেক আভাস পাওয়া যায়। বিমলাদেবীর পাকশালা নাই, শ্রীবলরামদেবের উৎকৃষ্ট ভোগান্নে দেবীর ভোগ হইয়া থাকে।

বিমলাদেবীর মন্দিরের পরেই ভাণ্ডারগৃহ। ক্রমশঃ গোপরাজ নন্দ, কৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠলীলা ও "ভাণ্ডগণেশ" দ্রষ্টব্য। তৎপরে পশ্চিম দ্বার; এই দ্বারের অপর নাম "খাঞ্জাদ্বার।"

শ্রীগোপীনাথ।

পশ্চিম দ্বারের গায়েই শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তি ও তদন্তরে মাখনচোরা। পরেই ক্রমশঃ সরস্বতী ও নীলমাধবের পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তি বিদ্যমান।

লক্ষ্মী-মন্দির।

তাহার পর লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। লক্ষ্মীর মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইহার গঠন ও আভ্যন্তরিক দৃশ্য অতি উত্তম। উড়িষ্যার নিয়মানুসারে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির পূর্ণাবয়ব; ইহাতে ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও মূলমন্দির চারিটী প্রকোষ্ঠই আছে। নাটমন্দির বেশ সাজান এবং তথায় সর্ব্বদাই অনেক লোক। লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ রন্ধনশালা আছে এবং ঐ রন্ধনশালায় অনেকগুলি বিগ্রহেরই ভোগান্ন হইয়া থাকে। নিকটেই পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলা বা ভদ্রকালীমূর্ত্তি। লক্ষ্মার নাটমন্দিরের উত্তরভাগে দুইটী মন্দির আছে; তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি। ঈশান কোণে সূর্য্যনারায়ণমূর্ত্তি ও তাহার পূর্ব্বে সূর্য্যদেব। সূর্য্যদেবের মন্দিরও বিশেষ দ্রষ্টব্য, ইহাও বেশ সুন্দর। পরে পাতালেশ্বর মহাদেব ও বলিরাজা। তৎপার্শ্বে উত্তর দ্বার—ইহার অপর নাম হস্তীদ্বার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমূর্ত্তি।

হস্তীদ্বারের পূর্ব্বদিকে শীতলার মূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি ও রাধাশ্যাম মূর্ত্তি। রাধাশ্যাম মন্দিরের দক্ষিণভাগে ও ভোগ মণ্ডপের ঈশানে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মূর্ত্তি। তাঁহার মানবদেহাবসানের কত পরে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে যে অল্পদিনেই তাঁহার মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের অপরপার্শ্বে পূজিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে তাঁহার ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিও আছে।

আনন্দ-বাজার।

শ্রীরাধাশ্যাম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির উভয়ই তিনশত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত এবং এই দুই মন্দিরের মধ্য দিয়া জগন্নাথদেবের স্নানবেদীতে যাইবার পথ। স্নানবেদীতে জন্মোৎসব ও স্নানযাত্রা হইয়া থাকে। স্নানমণ্ডপের অগ্নিকোণে চাহ্‌নি-মণ্ডপ এবং তথা হইতে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথদেবের স্নানোৎসব দেখেন। তজ্জন্যই মণ্ডপের নাম "চাহ্‌নি" মণ্ডপ। পশ্চাতে সিংহদ্বারের পর সিঁড়ীর উত্তরে পাণ্ডাগৃহ এবং তথায় মহাপ্রসাদ থাকে। আনন্দবাজারের প্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জন বিক্রয় হয়। অন্ন-ব্যঞ্জনের জাতি-বিচার নাই, কেবল কয়েকটী জাতি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না, সুতরাং তাহাদিগের স্পৃষ্টান্ন গ্রহণযোগ্য নহে। অন্নব্যঞ্জনবিক্রয়স্থান দেখিলে একেবারেই জাত্যভিমান যায় এবং দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি হয়। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরেও এই রীতি প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধরীতিই এইরূপ অনাচারের মূল, কিন্তু এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। গঙ্গাজল চণ্ডালভাণ্ডস্থ হইলেও পবিত্র ও পাবন; জগন্নাথদেবের প্রসাদও কেন পবিত্র হইবে না? বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগের জাতিভেদ নাই, প্রকৃত বিষ্ণুভক্তদিগেরও জাতিভেদ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মহাযান

বৌদ্ধদিগের মধ্যে জাতিভেদ থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব আধুনিক হিন্দুমতে বিষ্ণুর অবতার।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে॥—জয়দেব।

শ্রুতির উক্ত যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়াছেন, পশুবলি সদয় হৃদয়ে দেখিয়াছেন। হে কেশব, আপনি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। জয় জগদীশ হরে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপারপাত্র জয়দেব ও বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন আরও—

শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকূর্ম্ম-
কোলোহভবন্ নৃহরিবামনজামদগ্ন্যঃ।
যোহভূদ্ বভুব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ
কল্কীসতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেহরীন্॥

যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যিনি কলিযুগের অন্তে সাধুগণের শত্রুগণকে সংহার করিবার জন্য কল্কীরূপ ধারণ করিবেন, তিনি আমার চিত্ত শয্যায় শয়ন করুন। এখনও চট্টগ্রামের অনেক বাঙ্গালী পৌরাণিক ক্রিয়াশক্তবান্ হইয়াও বুদ্ধ-দেবকে পূজা করিয়া থাকে।

পুরী বহুকাল বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধাশ্রম ছিল, বটে, হয়ত নীলমাধব বুদ্ধদেবের নামান্তর, কিন্তু পুরীর অন্নাচার যে বৌদ্ধমূলক তাহার নিদর্শন কি? বৌদ্ধগণ পুরী ত্যাগ করিবার অনেক পরে কেশরীরাজ যযাতিকেশরী ইহার পুনরুদ্ধার করেন। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে পুরীতে বৌদ্ধদিগের আচার গ্রহণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রসাদ-মহাত্ম্যই সংস্পর্শদোষ না থাকার কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহা না হইলে এরূপ আচার ভুবনেশ্বরেও দৃষ্ট হইত না। এইরূপ আচার পূর্ণ ভক্তির চিহ্ন মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বের অবস্থা সম্ভবতঃ যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা গেল। তিনশত বৎসরে যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহারও অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। ইতিহাসাভাবে অনুমিতির উপর নির্ভর ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তবে মন্দির সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

ভেটমণ্ডপ।

জগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা মন্দির হইতে ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় লক্ষ্মী-দেবী "ভেটমণ্ডপে" অপেক্ষা করেন; ইহা সিংহদ্বারের দক্ষিণে। হস্তীদ্বারের সন্নিহিত দ্বিতল গৃহ "বৈকুণ্ঠ।" বৈকুণ্ঠপুরীতে প্রতি বৎসর কলেবর চিত্রিত হয় এবং ইহার নিকটে প্রায়ই দ্বাদশ বৎসরান্তে কলেবর পুনর্নির্ম্মিত হয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

সমুদ্রে স্নানান্তে সশিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রসাদান্নভিক্ষার্থ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

"সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্রস্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বাঙ্গালী। তিনি মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন এবং প্রবাদ আছে যে মিথিলায় নব্য ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া এবং বারাণসীতে বেদাধ্যায়ন করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করত নব্য ন্যায়ের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এবং সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সার্ব্বভৌমকে বেশ জানিতেন। নবদ্বীপ সম্বন্ধে পরিচয়

এই মাত্র ; কিন্তু গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে বেশ জানিতেন, বিশেষতঃ মুকুন্দের সহিত আচার্য্যের বিশেষ জানা শুনা ছিল। সার্ব্বভৌম প্রথমতঃ নবদ্বীপে, তৎপরে সমস্ত ভারতবর্ষে যশোলাভ করিয়া শেষ বয়সে পুরীতে বাস করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র কেবল যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাজাদিগের ন্যায় পণ্ডিতরত্নবেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উড়িষ্যার রাজপণ্ডিতপদে বরণ করিয়া পুরীতে বাস করান। আজকাল কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন যে বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসী পরস্পরকে পৃথক্ জাতীয় বলিয়া মনে করুক, পৃথক জাতীয় বলিয়া ব্যবহার করুক। কিন্তু সেকালে এরূপ চিত্তসংকীর্ণতা ছিল না। সেকালে বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের অধীন ছিল। হোসেন্ সাহার সুখ্যাতি থাকিলেও তিনি বাসুদেবসার্ব্বভৌমসদৃশ পণ্ডিতদিগকে প্রচুর মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিতেন বোধ হয় না। প্রতাপরুদ্র তৎকালে প্রবলপরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দুরাজা ; বাসুদেব তখন প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সহজেই পুরীতে,—জগন্নাথ ক্ষেত্রে, আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেছিলেন, এবং তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বও অনেকে তথায় থাকিতেন। গোপীনাথাচার্য্য সেই কুটুম্বগণের অন্যতম। সার্ব্বভৌম "চিন্তামণি" গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক ছিলেন।

সার্ব্বভৌম শ্রীমন্দিরের অনতিদূরেই বাস করিতেন। তিনি রাজপণ্ডিত, রাজসভার উজ্জ্বল রত্ন, সুতরাং রাজপ্রাসাদের নিকটেই থাকিতেন। কাল-স্রোতে তাঁহার আবাসভূমি ধ্বংস হইয়াছে।

জগন্নাথের ভোগ।

জগন্নাথ দেবের ভোগ তখনও যেরূপ ছিল এখনও প্রায় সেইরূপ। সেই প্রকার তণ্ডুলান্ন, পিঠা, পানা ও লাকরা ব্যঞ্জন। লাকরা লাউ ও অপরাপর পাঁচ তরকারীর ঘণ্ট, পানা পরমান্ন।

"সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাকরা ব্যঞ্জনে॥
পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে॥
জগন্নাথ যৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"প্রভু বোলে বিস্তর লাকরা মোরে দেহ।
পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সবে লহ॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ভোজনান্তে মহাপ্রভু স্বগণ সহ সার্ব্বভৌমের মাতৃস্বসার ভবনে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

"আমার মাতৃস্বসাগৃহ নির্জ্জন স্থান।
"তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব্ব সমাধান॥
"গোপীনাথ প্রভু লঞা তথা বাসা দিল।
"জল জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সার্ব্বভৌমের মাতৃস্বসার বাটী কোথায় ছিল?

সার্ব্বভৌমের মত-পরিবর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়া ও ফাল্গুনের শেষে জগন্নাথ দেবের দোলযাত্রা দেখিয়া বৈশাখের প্রথমেই দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। ফাল্গুন ও চৈত্র, দুই মাসের মধ্যেই তিনি লোকবৃন্দকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে হরিনামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা উৎকল ভূমিতে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি উৎকলে সর্ব্বত্র বিষ্ণু স্বরূপ পূজিত হইতেছেন। তাঁহার অগাধ প্রেম ও ভক্তি উৎকল দেশ প্লাবিত করিয়াছিল এবং তিন শত বৎসরেও সে প্রেম ও ভক্তিস্রোতের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই! কিন্তু দার্শনিক

মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করাই তাঁহার এ যাত্রার প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদাস সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈলা নীলাচলে বাস ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল।
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥"—৭ম পরিচ্ছেদ।

তাঁহার চরিত-লেখক মহোদয়গণ সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারের বিবরণ ও বেদান্ত-ব্যাখ্যা বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। আধুনিক অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে সে বিচার ও ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য; অন্ততঃ তাহা অনেকেরই ভাল লাগিবে না। বিচার ও ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ফলে তর্ক শেষে বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ণাবতারত্বের উপলব্ধি করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার প্রজাগণও মহাপ্রভুর সেবক হইলেন। মুরারি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

অনন্তর অপরাহ্নে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং সার্ব্বভৌমের নিকটে শ্রীহরির চরণাবলম্বী বেদান্তের নিগূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা করিলেন। বেদান্তের এইরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া এবং পূর্ব্ব মত সমূহ মিথ্যা বুঝিয়া মহাত্মা সার্ব্বভৌম বিস্ময়োৎফুল্ল মনে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন।

গোপীনাথাচার্য্য পূর্ব্বাবধিই মহাপ্রভুর মতাবলম্বী ছিলেন, সার্ব্বভৌম সেই মতেই দীক্ষিত হইলেন এবং কাশীমিশ্রও তাঁহার শিষ্য হইলেন। কাশী মিশ্র পুরীতে বিশেষ গণ্য ছিলেন।

পঞ্চতীর্থ।

দাক্ষিণাত্যে গমনের পূর্ব্বে প্রেমময়, ভক্তিময়, লোকশিক্ষয়িতা নবদ্বীপচন্দ্র দুই মাসের অধিক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে থাকিয়াও যে ক্ষেত্রস্থ অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ,

বিশেষতঃ সমগ্র পঞ্চতীর্থ, দর্শন করেন নাই ইহা মনে হয় না। তিনি যাজপুরে সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একাকী যাইয়া বিরজা দেবী প্রভৃতি দেবতাসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরে দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বর ও অন্যান্য লিঙ্গ দর্শন করেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হরিনামামৃতরসোল্লাসে এবং ওঁকাররূপীজগন্নাথদর্শনসুখে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিলেও অন্যান্য দেবমন্দির ও দেবদর্শন করিয়া তিনি যে ভূদেবীকে ভক্তিময় নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার চরিতলেখকেরা—মুরারি, বৃন্দাবনদাস, শ্রীকৃষ্ণদাস, কবিকর্ণপুর ও জয়ানন্দ মিশ্র—কিছুই বলেন নাই। এরূপ স্থলে পুরীর অন্যান্য দেবমন্দিরাদির কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে; কিন্তু ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দুরাজচূড়ামণি প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনীয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর অনতিপরেই উৎকলে হিন্দুরাজত্বের লোপ হইয়াছিল। মুসলমানেরা উৎকলের মোগলবন্দিপ্রদেশে অন্যূন দেড় শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। পরে মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দুরাজত্ব পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভেই সে রাজত্বের শেষ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সময়ের পর পুরীর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে; কিন্তু পঞ্চতীর্থাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পুরীর পঞ্চতীর্থ বহুকালাবধিই দর্শনীয়। কতকগুলি মঠ পরে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইংরাজদিগের আমলে রাস্তা ঘাটের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরাদির স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বিশেষ পরিবর্ত্তন না হওয়াই সম্ভব। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে খোলার পর পুরীর যাত্রীসংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে। পুরী ক্রমশঃ সমুদ্রতীরস্থ স্বাস্থ্যকর স্থান হইতেছে, কিন্তু মোটে ভক্তির পরিমাণ বেশী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না।

মার্কণ্ডেয় হ্রদ।

গুয় হ্রদ পঞ্চতীর্থের অন্যতম। ইহা শ্রীমন্দিরের প্রায় এক পো[illegible] উত্তরে। মার্কণ্ডেয়েশ্বর মহাদেবের মন্দির কেশরীরাজ কু[illegible]লকেশরীর সম[illegible] নির্ম্মিত। তিনি ৮১১ খৃঃ অব্দ হইতে ৮২৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উৎকলে রাজত্ব করেন, সুতরাং ঐ মন্দির অন্ততঃ ১০৮০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ইহা শৈব কেশরীদিগের একটী কীর্ত্তি। হ্রদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ খনন করাইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং তীর্থ ত্রৈলোক্যপাবন। সরোবরের জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু হিন্দুর ইহাতে স্নান করিয়া তর্পণ করা বিধেয়। তীরের দক্ষিণ দিকে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির। মন্দিরে দেবস্থান, মোহন ও নাট্যশালা আছে। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে বৃষভ; চতুর্দ্দিকে আস্থনা[illegible] হরপার্ব্বতী, ষষ্ঠীমাতা, ষড়ানন, পঞ্চপাণ্ডব ও ধবলেশ্বরলিঙ্গ। সরোবরের পূর্ব্বতীরে কালীয়দমন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি; শ্রীকৃষ্ণ কালীয় সর্পের ফণার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বংশীধ্বনি করিতেছেন। উত্তর ভাগেও একটী মন্দির; তন্মধ্যে ক্লোরাইট্ প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তি এবং গণেশ, নবগ্রহের ও নারদের মূর্ত্তি। যাজপুরে যে সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি সকল আছে, এখানেও মূর্ত্তি সকল প্রায়ই সেইরূপ। হংস-সংস্থিতা চতুর্বক্ত্রা ব্রাহ্মী, বৃষারূঢ়া পঞ্চবক্ত্রা ত্রিলোচনা শুক্লেন্দুধারিণী মাহেশ্বরী, ময়ূরস্থা ষড়্বক্ত্রা রক্তবর্ণা দণ্ডপাশধৃতা কৌমারী, শ্যামা ষড়্ভুজা বনমালিনী বৈষ্ণবী, কৃষ্ণবর্ণা শূকরাস্যা মহোদরী বারাহী, গজসংস্থিতা ঐন্দ্রাণী এবং ভীমরূপিনী খড়্গহস্তা শবারূঢ়া ষড়্ভুজা শ্বেতবর্ণা চামুণ্ডা আর্য্যজাতির শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্বেত গঙ্গা।

শ্বেতগঙ্গাতীর্থ শ্রীমন্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত। পুরুষোত্তম মহাত্ম্যে ও ব্রহ্মপুরাণে এই তীর্থ বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং পুণ্যার্থী

যাত্রীমাত্রই ইহাতে স্নান করিয়া থাকে। তীরদেশে ভগবানের শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধব মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজমান্।

যমেশ্বরাদি।

শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে, এক পোয়ার মধ্যে, যমেশ্বর, অলাবুকেশ্বর ও কপালমোচন মহাদেবের মন্দিরত্রয়। যমেশ্বরের পশ্চিমভাগে অলাবুকেশ্বর ও নিকটেই কপালমোচন। লিঙ্গত্রয়েরই পাবনী শক্তি অসীম। তিনটী মন্দিরই পুরাতন; ললাটেন্দুকেশরী অলাবুকেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন। যমেশ্বর পূজায় কোটিলিঙ্গপূজার ফল, অলাবুকেশ্বর দর্শনে ও পূজায় অপুত্রক পুত্রবান্ হয় এবং কপালমোচনপূজা দ্বারা ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর পুরুষোত্তমক্ষেত্রের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহা শ্রীমন্দির হইতে ঈশান কোণে ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত। পথ অশ্বযানযোগ্য। সরোবরের জল দেখিতে ভাল নয়, ইহাতে অনেক কচ্ছপ; এবং খাদ্যদ্রব্য দিলে অনেক কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য (মুড়কিও) নিকটে বিক্রয় হইতেছে। মার্কণ্ডেয় হ্রদের ন্যায় এখানেও স্নান ও পিতৃতর্পণ বিধেয়। সরোবর সুবিস্তীর্ণ ও চতুর্দ্দিক প্রস্তরে বাঁধান। সোপানও প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩২৪ হাত ও প্রস্থে ২৬৪ হাত। উৎকলখণ্ডে সরোবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত আছে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের খুরন্যাসে ইহা খাত হইয়াছে। সরোবরের দক্ষিণ তীরে ও প্রশস্ত সোপানের পূর্ব্বদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির। মন্দির কতদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে বলা যায় না কিন্তু খুব পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এ মন্দির দেখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অপরদিকে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির। নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব বহুকাল প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মন্দির বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না।

গুড়িচা গড়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের অনতিদূরেই গুড়িচা গড়। ইহা পুরাতন ও প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রধান রাণীর নাম হইতে গড়ের নামকরণ হইয়াছে। ইহার পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার। উত্তর দিকের দ্বারের নাম বিজয়দ্বার। দেবমন্দির উৎকল প্রণালী মত চারিভাগে বিভক্ত। মূল মন্দিরে রত্নবেদী ক্লোরাইট্ প্রস্তর নির্ম্মিত। নাট্যমন্দির বিবিধ কারুকার্য্যে সুসজ্জিত, প্রাঙ্গনও বিলক্ষণ প্রশস্ত এবং প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাঙ্গনে কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষ আছে; অশ্লীল মূর্ত্তির ও অভাব নাই। ব্রহ্মদারু দ্বারা জগন্নাথের মূর্ত্তি এখানে প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য গড়ের অপর নাম জনকপুর। সাধারণ লোকে ইহাকে মাসী বা মাউসী বাড়ী বলিয়া থাকে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া এই মন্দিরে সাতদিন বাস করেন এবং সিংহদ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। অন্য সময়ে সিংহদ্বার রুদ্ধ থাকে এবং প্রবেশ আয়াসসাধ্য।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর দ্বিতীয়বার যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাস করিতেছিলেন, তিনি রথযাত্রার দিন স্বহস্তে গুড়িচা মন্দির মার্জ্জন করিয়াছিলেন; গুড়িচা মন্দির মার্জ্জন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

"আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥
শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুড়িচা মন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জিল।
সিংহাসন মাজি চারি ভিত শোধিল॥

*　　*　　*

*　　*　　*

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
উর্দ্ধ অধ ভিত গৃহমধ্য সিংহাসন॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

লোকনাথ।

লোকনাথ মহাদেবের মন্দির শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে ক্রোশাধিক দূরে। মন্দিরের নিকটে সুপ্রশস্ত সরোবর। মন্দির দেখিলে ইহা খুব পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু প্রবাদ যে দশানন রাবণ ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গন প্রাচীরবেষ্টিত; দেবের ভোগ প্রস্তুতের স্থান ও নাট্যমন্দিরাদি উৎকলরীতি অনুসারে নির্ম্মিত। তথায় লোকসমাগম বিলক্ষণ, পণ্যবীথিরও অভাব নাই। দেবলিঙ্গ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে দেবী পীঠের ভিতর প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশ করিয়া লিঙ্গ দর্শন করা একটু কষ্টসাধ্য। ভিতরে জলের প্রস্রবণ আছে এবং সর্ব্বদাই জল দেবীপীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লিঙ্গ প্রায়ই জলে ডুবিয়া থাকে। এই মন্দিরের নিকটে একটী বড় মন্দিরে হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি। তথায় লোকনাথের ভোগমূর্ত্তিও অবস্থিত। ভোগমূর্ত্তি প্রত্যহ রাত্রিকালে শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হয়, কারণ লোকনাথ জগন্নাথ দেবের দেওয়ান। লোকনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি শিবরাত্রির দিন দেখিতে পাওয়া যায়। লোকনাথের মন্দির হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত প্রায়ই বালুময় বেলাভূমি।

স্বর্গদ্বার।

বঙ্গোপসাগরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের সুপ্রসিদ্ধ স্নানের ঘাট স্বর্গদ্বার। মহাসাগরে স্নান সর্ব্বত্রই পুণ্যজনক—তাহার ঘাট অঘাট নাই, কাল অকাল নাই। বিশেষতঃ পুরীর অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী বেলাভূমির যে স্থান দিয়াই অব-গাহন করা যাউক না কেন পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। এখানে হাঙ্গরের বা অন্য কোন দুষ্ট জলজন্তুর ভয় নাই বলিলেই হয়; যেখানে ইচ্ছা স্নান করা যাইতে

পারে। কিন্তু স্বর্গদ্বারে স্নান অতীব পুণ্যজনক এবং পিতৃতর্পণ ও মহাপ্রসাদের পিণ্ডদান প্রশস্ত। তরঙ্গময় মহাসাগরে অবগাহন পুণ্যজনক হইলেও সকল সময়ে সহজ নহে। বিভীষিকা না থাকুক, অনেকেই তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া এবং তরঙ্গের বলে স্থানচ্যুত হইয়া উপলখণ্ডের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতে ভীত হইয়া থাকেন। একে নীলিমাময়, সীমান্তরহিত, বিপুল জলরাশি ভীতির কারণ হইতে পারে; অবতরণই অনেকের পক্ষে ভয়াবহ; তাহাতে আবার প্রতি মুহূর্ত্তে মেঘনিস্বন ও ফেণরাশিময় উত্তাল তরঙ্গ। সমুদ্রে "ঢেউ খাইতে" হয়, কিন্তু অনেকেই "ঢেউ খাইতে" সাহস করে না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্বর্গদ্বারে ঢেউ খাওয়া একটী গুরুতর বিষয়; অথচ সাধারণতঃ ভয়ের কোন কারণ নাই। মহাসমুদ্রের একটী ঊর্ম্মি বেলাভূমি হইতে অধোগমন কালে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঊর্ম্মি মানব শরীরকেও সমুদ্রগর্ভস্থ শঙ্খাদির ন্যায় বেলাভূমির নিকটে তুলিয়া দিয়া প্রতিগমন করে। মানবদেহ সাগর তরঙ্গের ক্রীড়নক মাত্র। তবে যে কেহ কেহ হাত পায়ে ব্যথা পান না একথা বলা যায় না। তরঙ্গের প্রতি-রোধ করার সামর্থ্য নাই, অথচ প্রতিরোধের চেষ্টা বলীর সহিত নির্ব্বলীর ব্যায়ামের ন্যায় ক্লেশদায়ক হইতে পারে। মহাসমুদ্রের তরঙ্গে একখণ্ড সোলা মাত্র মনে করিয়া ভাসমান হইতে পারিলে,—মহাসমুদ্রের নিকট নিরহঙ্কার হইলে হস্তপদাদিভগ্নের সম্ভাবনা নাই। পুরীর পার্শ্বস্থ বঙ্গীয় উপসাগরে বেলা-ভূমির নিকটেই গভীর জল নাই; তরঙ্গ না থাকিলে অনেক দূর অবলীলাক্রমে চলিয়া যাওয়া যায়; সুতরাং স্নানের নিতান্ত অসুবিধা নাই।

রত্নময় সাগরগর্ভে মৃত জলজন্তুসমূহের অস্থিকঙ্কালেরও অভাব নাই। অনন্ত-কালের শঙ্খ, শম্বুক ও শুক্তির অজস্র আবরণ সাগরগর্ভে নিহিত রহিয়াছে এবং তরঙ্গ মাত্রই তাহার কতকগুলি বেলা ভূমিতে রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে এবং সাগরজলে পুনর্নিমীলিত হইতেছে। প্রাতঃকালে তটপার্শ্বে বেলাভূমিতে বিচরণ করিলে বিবিধ আকারের বিবিধ বর্ণের শঙ্খ, শম্বুকাদির সহস্র সহস্র

আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্যান্য জলজন্তুর অস্থিও দেখিতে পাওয়া যায়। কুলীরকও বিস্তর।

সকল সময়েই, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, স্বর্গদ্বারের দৃশ্য সুমধুর। অসীমের সীমান্তে অরুণোদয়ের দৃশ্য বড়ই সুন্দর ; সে দৃশ্য কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করে ? প্রাতঃসূর্য্য ও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত।

"গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে
তারকা মণ্ডল জনক মোতি ॥
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে।
সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতিঃ ॥"—গুরু নানক।

শুক্লপক্ষের নিশার দৃশ্য ও অভাবনীয়। চন্দ্রালোক তরঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া সহস্র সহস্র চাকচিক্যময় রজতখণ্ডের প্রভা উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বর্গদ্বারের নিকটে তাঁহার মানবলীলার শেষ ভাগে বাস করিয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি থাকিতেন তাহা স্বর্গদ্বারের সন্নিকট ; তাহাই এখন নিমাই চৈতন্যের মঠ। তথায় নিমাই-চৈতন্য-মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। মঠের নিকটে একটী নিম গাছ আছে এবং প্রবাদ যে ঐ বৃক্ষের প্রশাখা তিনি দাতনের জন্য ব্যবহার করিতেন। আরও প্রবাদ আছে যে এক সময়ে জগন্নাথদেবের দ্বাদশ বার্ষিকী মূর্ত্তির জন্য ঐ নিমগাছ ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল কিন্তু অলৌকিক শক্তি সে ব্যবহারের প্রতিরোধী হইয়াছিল। নিমাই চৈতন্য যে যে ভাবে রাত্রিকালে মহোদধি দেখিয়া পুলকিত হইতেন শ্রীবৃন্দাবন দাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"তবে কথো দিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র কুলেতে আসি করিলা বসতি ॥
সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌর সুন্দর ॥
চন্দ্রবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্র কূলে শ্রীশচীনন্দন ॥

সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বোলে শ্রীবদনে॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥
গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয়॥
সর্ব্বরাত্রি সিন্ধুতীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে॥

হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্বরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত।

নিমাইচৈতন্য মঠ।

নিমাই চৈতন্যমঠ অতি পুরাতন ; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ তিনি স্বর্গদ্বারের নিকটে যে অনেক দিন ছিলেন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

কানপাতা হনুমান্।

স্বর্গদ্বারের নিকটেই স্বর্গদ্বারসাক্ষী ও কানপাতা হনুমান্। হনুমান্ কান পাতিয়া সাগরের তরঙ্গের মেঘনিস্বন শ্রবণ করিতেছেন এবং শ্রীমন্দিরকে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

বিদুরপুরী।

নিকটেই "বিদুরপুরী।" মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের বিবরণ অনুসারে এখানে যাত্রীগণ শাক ও খুদের অন্ন প্রসাদ স্বরূপ পাইয়া থাকেন।

সুদামাপুরী।

অনতিপরেই সুদামাপুরী এবং নানকসাহী মঠ। এই স্থানেই পাতাল-গঙ্গা গুপ্ততীর্থ। পরেই স্বর্গদ্বার স্তম্ভ। ইহা একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ, অধিকাংশই বালুকা দ্বারা আবৃত।

দাক্ষিণাত্য যাত্রা।

১৪৩১ শকাব্দের (খৃঃ ১৫১২) বৈশাখের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণার্থ যাত্রা করিলেন—

"তিন মাস কাল মোর চৈতন্য গোঁসাই।
পুরীতে রহিল সঙ্গে করিয়া নিতাই॥
তার পর বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে॥"—গোবিন্দদাস।

বৈশাখের কোন তারিখে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণার্থ পুরী হইতে যাত্রা করেন প্রামাণিক কোন গ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বিমোহন করার পর অষ্টাদশ দিবস পুরীতে থাকিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণার্থ যাইতে উপক্রম করেন এবং জগন্নাথদেবের আজ্ঞা কহিয়া সহর্ষে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তথায় অষ্টাদশ দিবস অতিবাহিত করিয়া অতীব হর্ষসহকারে জগন্নাথদেবকে দর্শন পূর্ব্বক নিজ ভক্তজনকে বিমোহিত করিয়া তীর্থভ্রমণার্থ উপক্রম করিলেন। গমনের পূর্ব্বে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষভরে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন।

তাহার ইচ্ছা ছিল একাকী গমন করেন কিন্তু সহৃদয়গণের অনুরোধে জলপাত্র বহির্ব্বাসাদি বহনার্থ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দেন। গোবিন্দ (কামার) তাঁহার কড়চায় বলিয়াছেন, তিনি সঙ্গে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের নাম আছে।

"পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্রবস্ত্র নৈঞা।" গোবিন্দই কি কৃষ্ণদাস?

কোনার্ক।

কোনার্ক সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থনিচয়ে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। অর্ক-ক্ষেত্র সূর্য্যোপাসনার প্রধান স্থল, কিন্তু ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বেই অর্কক্ষেত্র পরিত্যক্তপ্রায় হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রসিদ্ধ অরুণস্তম্ভ পুরীতে লইয়া যাইয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া দ্বারের শোভা বর্দ্ধন করেন। এখন অর্কক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ মাত্র দ্রষ্টব্য, কিন্তু পরিত্যক্ত ভগ্না-বশিষ্ট আর্য্যকীর্ত্তির চিহ্ন এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা সুসভ্য জাতিদিগের পক্ষেও আদরনীয়। অর্কক্ষেত্র শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্ব্বে প্রায় ৯ ক্রোশ দূরে—মহাসমুদ্রের তীরে। পুরী হইতে পাল্কী বা গো-যান দ্বারা যাইতে হয়। পথ সুবিধাজনক নহে; এখন যাত্রীসংখ্যা খুব কম। চন্দ্রভাগায় স্নানার্থ তীর্থ-যাত্রীগণ বৎসরে একবার মাত্র যাইয়া থাকে এবং অরুণোদয়ে সাগরে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ দিয়া সূর্য্যালয় তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রমশঃ আলালনাথ দর্শন করিয়া এবং কূর্ম্মক্ষেত্র ও নৃসিংহক্ষেত্র অতিবাহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন। কূর্ম্মক্ষেত্র ও নৃসিংহক্ষেত্র তৎকালে উৎকলনাথ প্রতাপরুদ্রের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এই প্রদেশ এখন উড়িষ্যার অন্তর্গত না হইলেও তৎকালে উৎকলের অন্তর্গত ছিল। এখনও ঐ প্রদেশে উড়িয়া ভাষার প্রাদুর্ভাব। তাহার দক্ষিণে কর্ণাটরাজের রাজ্য ছিল। উৎকল ও কর্ণাট উভয়ই তখন হিন্দুভূমি, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। তখনও মুসলমান জয়স্রোত দাক্ষিণাত্যে বলবান্ হয় নাই। তখনও দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্র হিন্দুত্বের বিঘ্ন করিতে পারে নাই।

আলালনাথ দেবকে দর্শন ও স্তব করিয়া সময়ে কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মদেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কূর্ম্মনামক একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর নৃসিংহক্ষেত্রে যাইয়া ভগবান নৃসিংহ দেবকে দর্শন, স্তব, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাঞ্চনাচল সদৃশ উজ্জ্বল গৌরকান্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু গমনকালে অঙ্গপ্রভার তরঙ্গাবলী দ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে দক্ষিণ দিক্‌কে গৌরবর্ণময় করিতে করিতে এবং করুণাতরঙ্গ সম্বলিত দৃষ্টিপাত দ্বারা দাক্ষিণাত্যজনগণের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে আর্দ্র করিতে করিতে গোদাবরী তীর প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় বিশ্রমান্তে রামানন্দরায়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

আলালনাথ।

পুরীর অনতিদূরে মহাসাগরের নিকটেই আলালনাথের মন্দির। ইহাও দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে চতুঃপ্রকোষ্ঠে নির্ম্মিত। "সমুদ্রতীরেতীরে" আলাল-নাথ-পথ। ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সবাসঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা ॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এক দিন ও রাত্রি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত আলালনাথে কাটাইলেন।

"ক্রমে ক্রমে আলালনাথের শ্রীমন্দিরে।
পেহু ছিনু মোরা সব অতি ধীরে ধীরে॥
আলালনাথেরে হেরি ভাব উপজিল।
অশ্রুজলে সে স্থানের মাটী ভিজাইল॥
পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজন বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায়॥"—গোবিন্দদাস।

এখান হইতেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ আরম্ভ, এখান হইতে নিত্যানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব দিনই বাটী ফিরিয়াছিলেন। গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতে আগ্রহান্বিত; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা তিনি একাকী ভ্রমণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে হরি-নামামৃতের বীজবপন করেন। ভক্তগণের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।

দক্ষিণাবর্ত্ত।

তখনকার দক্ষিণাবর্ত্তে ও এখনকার দক্ষিণাবর্ত্তে অনেক প্রভেদ। পাঁচশত বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনকার ভ্রমণ ভয়-সঙ্কুল ছিল; এখন বিপদ নাই বলিলেই হয়। তখনকার দক্ষিণাবর্ত্তের নাম শুনিলে এবং গোবিন্দদাসের বর্ণনা পাঠ করিলে ভবভূতির বর্ণনা মনে হয়—

এই পার্ব্বত্য বন্য ভূভাগের সীমান্তপ্রদেশ সকল কোথাও নিঃশব্দস্তিমিত, কোথাও বা জন্তুগণের উচ্চধ্বনিতে পরিপূর্ণ, কোথাও বা বিশালকলেবর সর্পগণ স্বেচ্ছাবশতঃ নিদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে

অগ্নিপ্রজ্বলিত হইতেছে, কোথাও বা গহ্বর মধ্যে অল্লাল্প সলিল থাকায় তৃষ্ণাতুর কৃষকলাশগণ অজগর সর্পের অঙ্গবিগলিত ঘর্ম্মসলিল পান করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিঃশঙ্কে চলিলেন। অস্ত্রশস্ত্র নাই, ভয়ও নাই, তাঁহার ভয়েরই বা কারণ কি? ভক্তিতে তাঁহার অন্যান্য প্রবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিভীষিকাময় থাকিলেও প্রাচ্যঘাট পর্ব্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূবিভাগ পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বেও সভ্যজাতির বাসভূমি ছিল। বিশেষতঃ প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের দক্ষিণভাগ যেমন উর্ব্বরা, তেমনি শস্যশ্যামল ক্ষেত্রপূর্ণ ছিল; বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রে শস্য ছিল না। ক্ষেত্রেতর ভূমিও বিশেষ বনাকীর্ণ ছিল না। লেটারাইট্‌ময় আরক্তিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বৃক্ষলতাদি দ্বারা আবৃত হইলেও হিংস্রজন্তুর বাসোপযোগী ছিল না। ভূমি লেটারাইট্‌ময় হইলেও তাহাতে শস্যোৎপাদিকা শক্তির যথেষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বামপার্শ্বে চিল্কা হ্রদ, বিস্তীর্ণজলাশয়—লবণাম্বুরাশির ন্যায় স্বচ্ছ ও নীলাভ। এদিকে পর্ব্বতমালার অনুচ্চ আরক্তিম ধারাবাহিক শৈলপুঞ্জ প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা! এখানে মহাসমুদ্রের মহিমা নাই, সৌন্দর্য্য আছে। এখানে লবণাক্ত সাগরের মহাশাখার তরঙ্গমালার উত্তালত্ব নাই—বারিধি যেন কারাবদ্ধ হইয়া স্থির ও নিস্তব্ধ। চিল্কাহ্রদে মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও দ্বীপসদৃশ ভূমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। বোধ হয় যেন চিল্কাহ্রদের অনুকরণেই উড়িষ্যাবিভাগের কৃত্রিম জলাশয় সমূহ খাদিত হইয়াছিল।

এই রমণীয় ভূবিভাগ পবিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঋষিকুল্যা নদী পার হইলেন। তখন গঞ্জাম সহরের অস্তিত্ব ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তৎকালে এই প্রদেশ উৎকলের অন্তর্গত ছিল; এখনও তথায় অধিকাংশ লোকই উড়িয়া ও এখনও দেশপ্রচলিত ভাষা উড়িয়া। মহাপ্রভু অল্প দিনে কূর্ম্মক্ষেত্রে এবং সত্বরই কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন।

কূর্ম্মক্ষেত্র।

তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ কামনায় কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মরূপী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলেন।

"এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তারে কৈল স্তবন প্রণামে॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কূর্ম্ম বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার; তজ্জন্য কবি কর্ণপুর তদ্রচিত মহাকাব্যে বলিয়াছেন,—

কৃতী এবং কৃতজ্ঞ গৌরাঙ্গদেব নিজাবতার কূর্ম্মদেবকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং শিক্ষাগুরু হইয়া তথায় মধ্যাহ্ন-কালীন কার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহার মান বর্দ্ধন করিলেন।

কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মমন্দির উড়িষ্যা বিভাগের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় চতুঃপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তথায় কূর্ম্ম নামা ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেব নামা ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া রোগমুক্ত করেন।

নৃসিংহক্ষেত্র।

পরে কিয়দ্দূর গিয়া জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে পরমপ্রীতিসহকারে জিয়ড় নৃসিংহদেবকে দর্শন করিলেন এবং দর্শনকালে প্রেমোদয় হওয়ায় তাঁহার দেহ পুলকাঞ্চিত হইল।

পরমকৃপালু মহাপ্রভু পূর্ব্বভাবে তথা হইতে নৃসিংহক্ষেত্রে যাইয়া নৃসিংহদেবের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার ও তাঁহার স্তব করিলেন।

"জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কথো দিনে।"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

নৃসিংহদেবকে স্বয়ং প্রহ্লাদ স্থাপন করেন। কথিত আছে নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া লক্ষ্মীর সহিত সিংহাচলে আসিয়া বাস করেন। প্রহ্লাদও জীবনের শেষভাগে পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নৃসিংহক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় নৃসিংহদেবের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি-লেন। পশ্চাৎ সমস্ত প্রদেশ জঙ্গলময় হইয়াছিল। পরে কলিযুগে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পুরূরবা পুনঃ নৃসিংহ পূজা আরম্ভ করান। মূর্ত্তি চন্দনাবৃত, কেবল অক্ষয় তৃতীয়াতে চন্দনাবরণমুক্ত নৃসিংহমূর্ত্তি দেখা যাইয়া থাকে।

সিংহাচল বিশাখপত্তনম্ (Vizigapatam) হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে। পাহাড়ের উপত্যকায় সিংহাচল গ্রাম; ওয়ালটেয়ার সহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৩ ক্রোশ। সিংহাচল নামক বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের পাঁচ মাইল পরে ওয়ালটেয়ার। সিংহাচলপাহাড় ষ্টেশন হইতে ১।৷০ ক্রোশ দূরে। উহা ৮০০ ফিট্ উচ্চে; গ্রাম হইতে প্রায় ৭০০ ধাপ উচ্চে সিংহাচল-স্বামী নৃসিংহদেবের মন্দির। ধাপগুলি প্রশস্ত এবং ১৫ হইতে ২০টি ধাপের পর বিশ্রামস্থান (চাতাল) আছে। ধাপের ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ঝরণা। গ্রামে পশ্চিম বাহিনী নদী। বামে গোদাবরী ও দক্ষিণে চক্রধারা। কথিত আছে এখানে অন্তঃসলিলা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম আছে। সুতরাং স্থানটী পবিত্র, কিন্তু বর্ত্তমান কালে এখানে পীড়ার অসদ্ভাব নাই। দেবালয় বৃহৎ; কতদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে বলা যায় না; সম্ভবতঃ ৬০০ বৎসর হইবে; এখন দেখিলেই পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উড়িষ্যার প্রণালীতে দেবালয় গ্রে-নাইট্প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাকারবেষ্টিত। উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরের ন্যায় চারিদিকে আজকালের রুচিবিরুদ্ধ অঙ্কিতমূর্ত্তি অনেকগুলি আছে! কি উদ্দেশ্যে ঐ সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল জানিতে পারি নাই, শাস্ত্রানুসন্ধানেও উহার তথ্য বুঝিতে পারি নাই। শুনিলাম বিজয়নগরের রাজার আদেশে অনেকগুলি পলস্ত্রা দ্বারা আবৃত হইয়াছে।

মন্দির দুই অংশে বিভক্ত; প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গন ও বারেণ্ডা; বারেণ্ডা কোন্ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে শ্রীরামানুজাচার্য্য এবং অন্যান্য কোণে দেবীমূর্ত্তি। দেবতার আয় যথেষ্ট; এখনও পূজা ও ভোগ যথারীতি হইয়া থাকে। একটী অনুশাসন দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে সার্ব্বভৌম রাজা শ্রীকৃষ্ণরায় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশ জয় করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, বর্ত্তমান মন্দির ও নিকটস্থ আলয়াদি বিজয়নগরের রাজকীর্ত্তি। যাহা হউক সিংহাচল আমাদের তীর্থস্থান ও দ্রষ্টব্য। অনেকে ওয়ালটেয়ার স্বাস্থ্যের জন্য গমন করেন। সহজেই সিংহাচলস্বামী নৃসিংহদেবের পূজা করিয়া আসিতে পারেন। তথায় থাকিবারও কষ্ট নাই। পাহাড়ের নীচেই একটী ভাল বাঙ্গালা আছে। কি ইউরোপীয় কি দেশীয়, ভদ্রলোক মাত্রেই তথায় থাকিতে পারেন। তথা হইতে দেবমন্দিরে গমন ও প্রত্যাগমন বিশেষ ক্লেশকর নহে।

গোদাবরী।

নৃসিংহক্ষেত্রে অহোরাত্র যাপন করিয়া প্রাতঃকালেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুণ্যসলিলা গোদাবরীর অভিমুখ হইলেন। "দিক বিদিক্ জ্ঞান নাহি, রাত্রি দিবস," চলিয়া গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌতমী গোদাবরীর শাখা। বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী নগর গৌতমী শাখার উপর। অনেকে বলেন ইহারই পুরাতন নাম বিদ্যানগর।

"গোদাবরীর তীরে চলি আইলা কথো দিনে।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্ব ঘাট পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে নদীসনাথ করিয়া গোদাবরী প্রবাহিতা। গোদাবরী ভারতবর্ষের

একটী পবিত্র নদী—"গঙ্গাচ যমুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী।" ইহার দৈবোৎপত্তি ও পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান আছে। এদিকে প্রাকৃতিক রমণীয়তায় গোদাবরীধৌত ভূমি অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাকবি ভবভূতির দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা পড়িলেই গোদাবরীর তীরভূমির মনোহারিত্ব ও ভীষণত্ব উভয়ই বুঝিতে পারা যায়।

গোদাবরীর তীরে অনেকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহাতে পক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে; সেই সকল বৃক্ষে কপোত ও কুক্কুটগণ মনোহর শব্দ করিতেছে। পক্ষিগণ সেই বৃক্ষের পুরাতন ত্বকের মধ্য হইতে চঞ্চু দ্বারা পোকাগুলিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বাহিরে আনয়ন করিয়া তদীয় ছায়ায় ভূমিতে ঠোকরাইয়া খাইতেছে। চুলকণা রোগযুক্ত হস্তিগণ সর্ব্বদা গণ্ডপিণ্ড ঘর্ষণ করায় কম্পিত বৃক্ষ হইতে কুসুমরাশি জলে পতিত হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় যেন তীরস্থ বৃক্ষরাজি কুসুম দ্বারা গোদাবরীর অর্চ্চনা করিতেছে।

একটী শ্লোকে কত কথা, কি বর্ণনা! কিন্তু উত্তরচরিতের বনভূমি মধ্যভারতের; দণ্ডকারণ্য তৎকালে প্রকৃতই অরণ্য ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের স্থান। বঙ্গোপসাগরের অনতিপশ্চিম প্রদেশ মহাপ্রভুর হরিনাম-বিজয়কালে বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল না; অনেক স্থলেই লোকালয় ছিল। স্থানে স্থানে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে কৃষিজীবিগণের গৃহশ্রেণী, স্থানে স্থানে ঘাটশৈলরাজির বনাবৃত তুঙ্গ ভূমি।

ভক্তনাথ কৃপালু গৌরাঙ্গদেব গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গোত্থিত সলিল-কণিকায় সুশীতল লতাশ্রেণীর আন্দোলনকারী সমীরণপ্রবাহে ইতস্ততঃ ভূরিসঞ্চালিত পার্ব্বত্য বন সন্দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কদম্বতরুরাজির মধ্যে শব্দায়মান মৃদঙ্গ, উল্লাসযুক্ত নৃত্যকারী ময়ূরের পুচ্ছ এবং বিশ্বাসপূর্ণহৃদয়ে উত্তোলিতলোচন হরিণীসমন্বিত হরিণগণকে দেখিয়া আরও আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভুর গমনপথে বক্র ভূভাগের কোথা

স্থান নিঃশব্দ ও শান্ত, কোন স্থান প্রতিধ্বনিত দিঙ্মণ্ডল, কোথাও বা নিদ্রিত বৃহৎকায় ভয়ানক প্রাণীর শ্বাসবায়ুতে অনল প্রদীপ্ত হইতেছে। গোদাবরী নদীর বেগদ্বারা মহাশব্দযুক্ত ভয়ানক গিরিপ্রস্রবণ সমূহ স্বীয় ধ্বনিতে শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকেও সমধিক অধীর করিয়া তুলিল। ক্ষণে ক্ষণে শুকপক্ষীগণের পদ স্খলিত ও পক্ষ বিকম্পিত হইতেছে এবং চঞ্চু হইতে বীজচয় পতিত হইতেছে। কোথাও বা পক্ষীগণ দাড়িম্বফল বিদলিত করিয়া বস্চুম্বন করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শুকপক্ষী সকল দেখিয়া গোদাবরীর তীর-বনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কোথাও তাম্বুললতার পত্রশব্দকে উচ্চ ও উগ্র শব্দ ভেদ করিতেছে এবং অতিদীর্ঘ ঝিল্লী-ঝঙ্কাররবে নিরতিশয় রমণীয়তা প্রকাশিত হইতেছে। কোথাও বা চন্দ্রনক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণস্পর্শী মেঘতুল্য তমালমালা, অর্জ্জুন ও কোবিদারবৃক্ষসমূহ শব্দায়মান নানাবিধ পক্ষিগণ সম্বলিত হইয়া রহিয়াছে। অন্যত্র সম্মিলিত চমূরু ও চমর মৃগগণ দ্বারা নিতান্ত রমণীয়তা প্রকাশ হইতেছে। কোথাও বা সুন্দর ভূভাগ সৌরকর সম্পর্করহিত এবং বৃক্ষসমূহের সান্দ্র, স্নিগ্ধ ও অতিসুশীতল মূলদেশ অকৃত্রিম আলেপন দ্বারা সুপরিষ্কৃত। আবার অন্যত্র অসংখ্য দীর্ঘিকা ও তড়াগাদি ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া রাজমহেন্দ্রী শোভা পাইতেছে।

গোদাবরীতে স্নানান্তে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি বৈষ্ণব-চূড়ামণি রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজমহেন্দ্রী উৎকলের দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী ছিল এবং রায় রামানন্দ তথায় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তথায় গোপালজিউর মন্দির ছিল। এখনও একটী আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রামানন্দরায়ের সহিত দশ দিন তথায় কাটাইলেন। দামোদর ও স্বরূপের কড়চায় ও চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দরায়ের সহিত মিলনের কথা বিশেষ বিবৃত আছে এবং তজ্জন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট রাজমহেন্দ্রীর বিশেষ খ্যাতি।

"এইরূপে রামানন্দ দশ দিন আসি।
আনন্দিত হয় হেরি নদের সন্ন্যাসী ॥
দেখি রামানন্দে প্রভু বড় প্রীতি পান।
প্রভুরে দেখিলে রায় হয়েন অজ্ঞান ॥
রায়ের নিকট হৈতে লইয়া বিদায়।
ত্রিমল্লনগরে প্রভু প্রবেশ করয় ॥"—গোবিন্দদাস।

রাজমহেন্দ্রীর পরেই প্রকৃত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ।

১ম খণ্ড সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট

ক

খ

গ

য

র

ল

শ